বৃষ্টি ও বজ্র

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

ভাষা-শহীদ

গ্রন্থমালা

বৃষ্টি ও বজ্র

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

বা ং লা এ কা ডে মী ঢা কা

বাএ ৪২৬৯

ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা

প্রথম প্রকাশ : ৫ পৌষ ১৩৯২/ডিসেম্বর ১৯৮৫। দ্বিতীয় প্রকাশ : ৭ পৌষ ১৩৯৫/ডিসেম্বর ১৯৮৮। পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ। প্রকাশক : পরিচালক, গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : চৈত্র ১৪০৮/মার্চ ২০০২। প্রকাশক : উপপরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক উপবিভাগ [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প], বাংলা একাডেমী, ঢাকা। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯/মে ২০০২। প্রকাশক : ফজলুর রহিম, উপপরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক উপবিভাগ [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প], বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মুদ্রক : মোঃ হামিদুর রহমান, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : কাইয়ুম চৌধুরী। মুদ্রণসংখ্যা : ২৫০০০ কপি। মূল্য : ২০.০০ টাকা মাত্র।

BHASHA-SHAHEED GRANTHAMALA : Series in honour of the martyrs of the Language Movement of February 1952.

BRISTI-O-BAJRA [Rain and Thunder] by Muhammad Ibrahim. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. Second Reprint : May 2002. Price : Taka 20.00 only.

ISBN 984-07-4278-7

উৎসর্গ

বর্ষণ সন্ধ্যার বিষণ্ণতায়ও
এ বই পড়তে যার ভাল লাগবে

প্রসঙ্গ-কথা : দ্বিতীয় সংস্করণ

মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ ১৯৮৫ সালে 'ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত একশ' একটি বইয়ের সকল শিরোনামা এখন নিঃশেষিত। পাঠকদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্প্রতি এই সব গ্রন্থের পর্যায়ক্রমিক পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে (১৯৮৭-৮৮) প্রকাশিত দশটি বইয়ের অন্যতম মুহাম্মদ ইব্রাহীম রচিত 'বৃষ্টি ও বজ্র'।

বৃষ্টি ও বজ্র আমাদের এতো পরিচিত যে তাদের সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ প্রকৃতিবিষয়ক রচনায় বার বার ঘুরে ঘুরে আসে। কিন্তু এই দু'টি প্রাকৃতিক ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে খুব বেশী কারো জানা আছে বলে মনে হয় না। ডক্টর মুহাম্মদ ইব্রাহীম অনেকটা কথকতার ভঙ্গিতে দুটি পুরাতন বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করেছেন বর্তমান গ্রন্থে।

এই গ্রন্থের প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকল সহকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

প্রসঙ্গ-কথা

বাহান্নোর ভাষা-শহীদেরা মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর দেখতে চেয়েছিলেন, সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় অবাধ বিচরণ আজো স্বপ্ন। এ স্বপ্নকে খানিক-টুকু হলেও সত্য ক'রে তোলার এক বিনীত চেষ্টা থেকে এ গ্রন্থমালা।

বাংলা একাডেমী সকলের একাডেমী। সবারই দাবি এর উপর। এ গ্রন্থমালার বই তাই সবার জন্যে। কেবল বিশেষজ্ঞের জন্যে নয়, কেবল শিক্ষার্থীর জন্যে নয়। নানা বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থমালা — জ্ঞানের সব দিগন্তই যেন একদিন ছুঁতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেকেই এই প্রথমবারের মতো লিখলেন কিংবা এই প্রথমবারের মতো বাংলায় লিখলেন। আমাদের চিন্তার ভুবনে নতুন কণ্ঠ বড়ো প্রয়োজন।

বৃষ্টি আমাদের ঘিরে রাখে। বৃষ্টি নামে সবার আঙিনায়। বজ্র চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কি এই বৃষ্টি? কি এই বজ্র? বৃষ্টি ও বজ্রের স্বরূপ নিয়ে এ বই।

এ গ্রন্থমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মী ও অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ভাষা-শহীদদের বারবার শ্রদ্ধা জানাই।

মনজুরে মওলা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

তব রবি কর আসে কর বাড়াইয়া
এ আমার ধরণীতে
সারাদিন দ্বারে রহে কেন দাঁড়াইয়া
কী আছে কী চায় নিতে।

অদৃশ্য আরোহী

অল্প কথায় গল্প শেষ

মাঠ ঘাট সাগর নদীর পানি সূর্য-তাপে বাষ্প হয়ে গেলো বাতাসে। সেই উত্তপ্ত ও আর্দ্র বাতাস উঠে গেলো উপরে। ওখানে বাতাসের ওপর চাপ কম, তাই তা প্রসারিত হয়ে শীতল হলো। যথেষ্ট শীতল হলে বাতাসের জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে অতি ক্ষুদ্র জলবিন্দু কি বরফ বিন্দুর আকারে ভাসতে লাগলো আকাশে। সেটিই মেঘ। কখনো কখনো ঐ ক্ষুদ্র জলবিন্দু সংঘবদ্ধ হয়ে পরিণত হলো বড় পানির ফোঁটায়, কিংবা বরফের টুকরোয়। ওভাবে ভারি হয়ে ওরা তখন ঝরে পড়লো বৃষ্টি রূপে, শিলাবৃষ্টি রূপে কিংবা তুষারপাতে। আরো সংক্ষিপ্ত শব্দ প্রয়োগে বলতে হলে প্রথমে পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে পানির বাষ্পীভবন, তারপর উপরে গিয়ে তার ঘনীভবনের ফলে মেঘ সৃষ্টি, তারপর অধঃক্ষেপনের ফলে বৃষ্টি। এই হলো আমাদের চিরন্তন জলচক্র—মনে হয় অতি সনাতন, অতি সরল, অতি সংক্ষিপ্ত।

কিন্তু আসলে কি তাই? তাই যদি হতো তা হলে এই বই এখানেই ফুরিয়ে যেতো, মেঘ-বৃষ্টি নিয়ে আরো মৌলিক আরো শত শত বই লেখারও প্রয়োজন হতো না। আর আজ এতদিন পরেও আকাশে জল-হাওয়ার রহস্য উদঘাটনের জন্য এত গবেষণা চলতো না। এই

আপাত-সংক্ষিপ্ত কাহিনীর পদে পদে এখনো বহু প্রশ্ন, বহু সন্দেহ, বহু রহস্য। এরকম কিছু কিছু প্রশ্নের জবাব আমরা এই সবে পেতে শুরু করেছি বলা যায়।

পানি যায় বাতাসে

কাহিনীর সূত্রপাত ভূ-পৃষ্ঠের জল-তল থেকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে। পানির অণুগুলো সব সময় কম বেশি ছুটাছুটিতে ব্যস্ত। উত্তাপ বেশি হলে এই ছুটাছুটিও বাড়ে। এর মধ্যে সব সময় কিছু কিছু অণু থাকে যাদের গতিবেগ যথেষ্ট বেশি। পানির পৃষ্ঠদেশে থাকলে এ রকম হাই-জাম্প দেয়া কোনো কোনো অণুর পক্ষে অন্যান্য অণুর আকর্ষণের মায়া কাটিয়ে বাতাসে পাড়ি দেয়া সম্ভব হয়। পানি যত উত্তপ্ত হবে এ ধরনেব অণুর সংখ্যাও তত বাড়বে। জল-তলের উপরে গিয়ে এসব অণু তৈরি করে পানির গ্যাসীয় অবস্থা—জলীয়বাষ্প। তরল অবস্থায় পানিকে দেখা যায়। কিন্তু গ্যাসীয় অবস্থায় তা বাতাসের মতোই অদৃশ্য থেকে বাতাসের সাথে মিশে যায়।

পানির পৃষ্ঠদেশ থেকে একটা অণু মুক্ত হয়ে উঠে গেলে তা যে আবার ফেরত আসতে পারে না এমন নয়। উঠে গিয়ে গ্যাসীয় অবস্থায় ছুটাছুটি করাব সময় জলীয়বাষ্পের একটি অণু যদি আবার পানির পৃষ্ঠদেশে ঢুকে পড়ে তা হলে তার সেখানে বন্দী হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে বলা হবে ওটা ঘনীভূত হয়ে পুনরায় তরল হয়েছে। সারাক্ষণ এই দুটি প্রক্রিয়াই চলতে থাকে। তবে মোটের উপর মুক্ত হওয়া অণুর সংখ্যা যতক্ষণ ধরা দেয়া অণুর চেয়ে বেশি হবে, ততক্ষণ আমরা বলবো বাষ্পীভবন চলছে।

আর্দ্র বাতাস, বাষ্পচাপ

জলীয়বাষ্প বাতাসে মিশলে আমরা বলি বাতাসটা খানিক ভিজলো, আর্দ্র হলো। এই জলীয়বাষ্পের একটা নিজস্ব চাপ আছে, যে কোনো গ্যাসের মতো সেটি তার বাষ্পচাপ। বায়ুমণ্ডলের মোট চাপের সাথে এই বাষ্পচাপটুকুও যুক্ত হয়। একক আয়তনের মধ্যে যত বেশি পরিমাণ পানির অণু জলীয়বাষ্প হিসেবে এসে যোগ দেবে বাষ্পচাপ ততই বাড়বে। এই অণুগুলো পানির পৃষ্ঠদেশ থেকে যে বের হয়ে আসছে তাও এক ধরনের বহির্মুখী চাপের কারণে—যা পানির অণুর ছুটাছুটির সাথে সম্পর্কিত। বাষ্পচাপটি কাজ করে এই বহির্মুখী চাপের বিপরীতে। এই দুই চাপ যখন সমান হয়, তখন বাষ্পীভবন বন্ধ হয়ে যেতে চায়। ঠিক এই পরিমাণ বাষ্প-চাপকে বলা হয় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ। এ অবস্থায় বাতাস যেন জলীয়বাষ্পে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তাই নতুন করে আর পানি নিতে পারে না। উত্তাপ অধিক হলে পানির পৃষ্ঠে বহির্মুখী চাপ অধিক হয়, কাজেই তার সমান হয়ে সম্পৃক্ত হবার জন্য বাষ্প চাপকেও অধিক হতে হয়। অধিক উষ্ণতায় তাই বাতাস বেশি জলীয়বাষ্প রাখতে পারে।

পানির উপর দিয়ে যদি বায়ুপ্রবাহ থাকে তা হলে বাষ্পীভবন দ্রুততর হয়। পানির ঠিক উপরে যে বাতাস তা সম্পৃক্ত হয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই সেটি সরে গিয়ে কম আর্দ্র বাতাস আসতে পারলে বাষ্পীভবনের সুবিধা হয়। ভেজা কাপড় বাতাসে শুকাবার কায়দাটি এভাবেই সম্ভব হয়।

জলীয়বাষ্পে শক্তির সঞ্চয়

বাষ্পীভবনের সময় পানির সেই অণুগুলোই বেরিয়ে পড়ে যেগুলো অপেক্ষাকৃত অধিক গতিশীল অর্থাৎ অধিক শক্তিধর। আর যেগুলো

পানির পৃষ্ঠদেশে থেকে গেলো সেগুলো অপেক্ষাকৃত কম গতিশীল। উষ্ণতার প্রকাশ যেহেতু অণুর গতিশীলতায়, তাই এভাবে বাষ্পীভবনে পানির উত্তাপ খানিকটা কমে যায়। ক্রমাগত পানিকে উত্তাপ না যুগিয়ে গেলে বাষ্পীভবনের হার কমে যেতে বাধ্য। এই তাপ শক্তিটা যোগাচ্ছে কে? কেন, পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি যোগানের মূলে যে কাজ করে সেই শক্তিদাতা সূর্য!

পৃথিবীর মহাসাগরগুলো তো বটেই, যাবতীয় পানির পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে বাষ্পীভবন ঘটাচ্ছে সূর্য। প্রতি বছর সারা পৃথিবী থেকে এভাবে যে পানি বাষ্পীভূত হয় একত্রে দেখলে তার আয়তন হতো ১২৪,০০০ ঘন মাইল। এর মধ্যে ১০৯,০০০ ঘন মাইল ওঠে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে আর ১৫,০০০ ঘন মাইল ওঠে স্থলভাগের নানা উৎস থেকে। যে পরিমাণ সৌরশক্তি পৃথিবীর গায়ে এসে পৌঁছায় তার এক-তৃতীয়াংশই ব্যয়িত হয় এই বিপুল পরিমাণ পানিকে জলীয়বাষ্পে পরিণত করতে।

এই প্রচণ্ড শক্তি কি এভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে? না, তা সঞ্চিত থাকছে মাত্র, ঐ জলীয়বাষ্পের মধ্যে। পানির পৃষ্ঠ থেকে আরো বেশি বেশি অণু বেরিয়ে এসে বাষ্প হতে যে শক্তি তাদেরকে যোগাতে হয় তা তাদের নিজেদের মধ্যেই জমা থাকছে এক ধরনের সুপ্ত শক্তি হিসেবে। যতক্ষণ এরা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ এর প্রকাশ ঘটবেনা। কিন্তু বাষ্প যখন ঘনীভূত হয়ে তরলে পরিণত হবে তখন এই সুপ্ত শক্তি আবার বেরিয়ে আসবে উত্তাপ রূপে। মেঘ সৃষ্টি বা বৃষ্টিপাতের সময় এমনটি ঘটে। এক হিসেবে দেখা গেছে কোনো এলাকায় এক ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হওয়া সে এলাকার উপর তিনদিন পরিষ্কার সূর্য কিরণ পড়ার সম পরিমাণ শক্তি নিঃসরিত করতে পারে। কাজেই জলীয়বাষ্প যখন বায়ুপ্রবাহের সাথে দূর দুরান্তে যায় তখন

তার সাথে নিয়ে যায় অনেকখানি সুপ্ত তাপ-শক্তি। পৃথিবীর নানা অংশের মধ্যে তাপ-শক্তি চলাচলের এ একটি বাহনও বটে।

গাছপালার গুরুত্ব

বলা হয় গাছ কেটে ধ্বংস করলে বৃষ্টিপাত কমে যাবে। কথাটা সত্য, কারণ গাছ থেকে বিশেষ করে গাছের পাতা থেকে প্রচুর পরিমাণ পানি প্রতিদিন বাষ্পীভূত হয়। প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় প্রস্বেদন। প্রস্বেদনে কিছু পানি চলে গেলে নতুন করে পানি মাটি থেকে উঠতে পারে গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সার নিয়ে। গাছের লাভ এদিক থেকে। আর আমাদের লাভ এটা জলীয়বাষ্প দিয়ে বাতাসকে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে। পানিটা অবশ্য মাটি থেকেই আসছে তবে মাটি তা ফেরৎ পেয়ে যায় বৃষ্টিরূপে। স্থানীয় বৃষ্টিপাতের প্যাটার্নে তাই অধিক গাছপালা থাকার একটা ভূমিকা রয়েছে। নিরক্ষীয় অনেক স্থলভাগে, যেমন আমাজান অববাহিকায় অত্যন্ত ঘন বর্ধনশীল গাছপালার সমারোহ সেখানে নিত্য প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণ ঘটায়। গাছপালা থেকে প্রচুর প্রস্বেদিত জলীয়বাষ্প ওখানকার বাতাসে মেশে। অবশ্য বায়ুপ্রবাহের সাথে জলীয়বাষ্প দূর থেকেও আসতে পারে বলে স্থানীয় বাষ্পীভবনের প্রভাবটি সীমিত প্রকৃতির।

আর্দ্রতার পরিমাপ

বাতাস কতখানি ভেজা তার একটা পরিমাপ প্রয়োজন। আগেই দেখেছি জলীয়বাষ্পের বাষ্পচাপ সে রকম একটা পরিমাপ দিতে পারে। আর একটা পরিমাপ হতে পারে একটা নির্দিষ্ট আয়তনের বাতাসে থাকা পানির ওজন। একে বলা হয় 'পরম আর্দ্রতা'। সম্পৃক্ত অবস্থার সাথে তুলনা করে আরো এক ধরনের পরিমাপ সচরাচর ব্যবহার করা হয়, যাকে বলা হয় আপেক্ষিক আর্দ্রতা। এতে আর্দ্রতাকে

প্রকাশ করা হয় সম্পৃক্ত অবস্থায় যত পানি একক আয়তনে থাকতো তার শতকরা অংশ হিসেবে। অর্থাৎ সম্পৃক্ত অবস্থায় বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১00%। একক আয়তনে পানির পরিমাপ সম্পৃক্ত অবস্থার অর্ধেক হলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫0%। আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য নানা ধরনের যন্ত্র রয়েছে বিভিন্ন নীতির উপর ভিত্তি করে, এদের বলা হয় হাইগ্রোমিটার।

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বৃষ্টি-জলের যাত্রা শুরু হলো অদৃশ্য বাতাসের অদৃশ্য আরোহী হিসেবে। দেখা যাক এটা যাচ্ছে কোথায়।

ধূলো বালি দিয়ে করতালি
নিত্য নিত্য করে নৃত্য
দিকে দিকে দলে দলে
আকাশে শিশুর মত অবিরত কোলাহলে

মেঘের সৃষ্টি

ঘনীভবন ঃ আবার তরলে

বাষ্পীভবনের ফলে তরল পানি গ্যাসে পরিণত হয়। এর বিপরীত প্রক্রিয়ায় জলীয়বাষ্প আবার তরল পানি রূপে ফিরে আসে। একেই বলা হয় ঘনীভবন। বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজন ছিলো উত্তাপের। ঘনীভবনের জন্য প্রয়োজন শীতলতার। যে কোনো কারণে উত্তাপ কমে গেলে বাতাসের মধ্যকার কিছু জলীয়বাষ্প এভাবে ঘনীভূত হতে পারে।

বাতাস জলীয়বাষ্পে সম্পৃক্ত হবার কি মানে তা আমরা দেখেছি। ঐ উত্তাপে যতখানি পানি বাতাসে জলীয়বাষ্প রূপে থাকতে পারে ততখানি ওতে রয়েছে—তাই ওটা সম্পৃক্ত। নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয়-বাষ্পের জন্য যে উত্তাপে এই সম্পৃক্তি ঘটতে পারে তাকে শিশিরাঙ্ক বলা হয়। এর কারণ এ অবস্থা থেকে উত্তাপ একটু নামলেই সব জলীয়বাষ্প বাতাস আর ধরে রাখতে পারবে না; কিছুটা ঘনীভূত হয়ে তরল পানিতে পরিণত হবে। শিশিরের সৃষ্টি এভাবে বলেই এই উত্তাপটি শিশিরাঙ্ক।

আর্দ্র গরম দিনে গ্লাসে ঠাণ্ডা বরফ-পানি রাখলে গ্লাসের বাইরের দিকটাও ভিজে উঠতে দেখা যায়। সেটা এভাবে ঘনীভূত হওয়া পানি, বাইরের বাতাস থেকে এসেছে। আর্দ্র বাতাস গ্লাসের ঠাণ্ডা

গায়ের সংস্পর্শে এসে শীতল হয়েছে এবং নিজের সব জলীয়বাষ্প আর ধরে রাখতে পারেনি। এখানে বাতাস শীতল হয়েছে সরাসরি শীতল বস্তুর সংস্পর্শে এসে। কিন্তু শীতল হবার আরো অন্য উপায়ও বাতাসের রয়েছে।

গরম বাতাসের ঊর্ধ্ব যাত্রা

বাতাসের কিছু অংশ অন্যান্য অংশের তুলনায় অধিক উত্তপ্ত হলে তা উপরে উঠে যেতে চায়। উষ্ণতর বাতাসের অণুগুলোর ছুটাছুটি বেশি, তাই তারা অধিক জায়গা জুড়ে বিস্তৃত হয়, অর্থাৎ প্রসারিত হয়। ফলে এ বাতাসের ঘনত্ব কমে যায়, এ অপেক্ষাকৃত হালকা বাতাস। এ রকম বাতাসের চাপ আশেপাশের শীতলতর বাতাসের চাপের তুলনায় কম হবে।

উত্তপ্ত হবার ফলে অবস্থাটি সৃষ্টি হয় এরকম। গরম বাতাসকে প্রসারিত হতে হচ্ছে। অথচ তার চারপাশের ঠাণ্ডা বাতাসের অধিকতর চাপ তার গায়ে ঠেসে আছে। ফলে প্রসারিত হবার মতো তার একটি পথই খোলা আছে—সেটি উপরের দিকে। তাই গরম বাতাস উপরে উঠে যায় আর শীতল বাতাস নিজ চাপে এসে তার জায়গাটুকু দখল করে নেয়। গরম বাতাসের জলীয়বাষ্প ধারণের ক্ষমতাও অধিক। কাজেই বাষ্পীভবন ভূ-পৃষ্ঠের নিকট ঘটলেও গরম বাতাস তার উর্ধ্বযাত্রায় এই জলীয়বাষ্পকে নিয়ে যাচ্ছে অনেক উপরে।

শীতল হবার অন্য উপায়

বায়ুমণ্ডলে বাতাসের শীতল হবার যে **ক'টি** প্রক্রিয়া রয়েছে তার মধ্যে বাস্তবক্ষেত্রে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যাকে বলা হয় 'রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়া'। এর একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সাইকেলের টায়ারে পাম্প

করার সময় দেখা যায় যখন পাম্পারের ভেতর বাতাসকে সঙ্কুচিত করা হয় তখন ওটা বেশ গরম হয়ে পড়েছে। ওর মধ্যে বাতাসকে সঙ্কুচিত করার জন্য যে 'কাজ' করা হয়েছে তার শক্তিটুকুই ওভাবে উত্তাপ-বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। আবার বাতাস ভর্তি সাইকেল টায়ারের পাম্প ছেড়ে দিয়ে বেরুনো বাতাসের সামনে হাত রাখলে অনুভব করা যায় যে ও বাতাসটা শীতল। টায়ার থেকে বের হয়ে হঠাৎ অনেক বড় জায়গায় প্রসারিত হয়ে পড়ে বলেই ওখানে বাতাসের উত্তাপ কমে যায়। বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপের বিরুদ্ধে প্রসারিত হতে গিয়ে টায়ারের বাতাসকে নিজেকে কাজ করতে হয়েছে। ফলে সে তার অভ্যন্তরীণ শক্তির কিছুটা ব্যয় করে ফেলে শীতল হয়ে পড়েছে। এই উভয় ক্ষেত্রে বাতাসের উত্তাপের বৃদ্ধি বা হ্রাসের কারণ তার অভ্যন্তরীণ শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস। এতে কোনো তাপ বাইরে থেকে আসেও নি, বাইরে যায়ও নি। তাই এদেরকে রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়া বলা হয়। অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত ও হালকা বাতাস যখন বায়ুমণ্ডলের উপরে উঠে যায় তখন রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়াতেই তার উত্তাপ হ্রাস পায়। উপরে উঠলে বাতাসের ওপরকার চাপ কমে যায়, কারণ তার উপরের বাতাসের পরিমাণ ও ওজন কম। চাপ কমে যাওয়াতে এখানে এসে বাতাস প্রসারিত হয়ে বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। কাজেই সেই টায়ারের বাতাস প্রসারিত হবার মতো এও শীতল হয়ে পড়বে। উপরে উঠে কি হারে চাপ কমবে তার থেকে কি হারে উত্তাপ কমবে তার হিসেবও বের করা যায়। দেখা গেছে অপেক্ষাকৃত নিম্ন বায়ুমণ্ডলে প্রতি কিলোমিটার ওঠার জন্য উত্তাপ ১০^{o} সে. করে হ্রাস পায়। এভাবে কোনো এক উচ্চতায় এসে উত্তাপ শিশিরাঙ্কে নেমে আসতে পারে, আর ঘটতে পারে ঘনীভবন। কিন্তু না, উর্ধ্বাকাশে ব্যাপারটি এত সহজে হবার নয়।

ধূলি-বীজের আশ্রয়

বাষ্পীভবনের আলোচনায় দেখেছি জলীয়বাষ্প যখন পানির পৃষ্ঠের কাছে থাকে তখন সম্পৃক্ত বাষ্পের কিছু কিছু অণু আবার ওখানে বন্দী হয়ে সহজে ঘনীভূত হতে পারে। কিন্তু উর্ধ্বাকাশে ওরকম পানির পৃষ্ঠ তো পাওয়া যায় না, তাই সেখানে উত্তাপ শিশিরাঙ্কে কিংবা তারও নীচে নেমে আসার পরও ঘনীভবন ঘটতে চাইবেনা। এরকম অবস্থাকে বলা হয় অতি সম্পৃক্ত। আসলে ওখানে বাতাস যদি একদম পরিষ্কার হতো তা হলে জলীয়বাষ্প ঠাণ্ডা হয়েও অতি-সম্পৃক্ত হয়ে থাকতো, ঘনীভবন আদৌ হতো না। গবেষণাগারে পরিষ্কার করে ছেঁকে নেয়া বাতাসে তাই দেখা গেছে। কিন্তু উর্ধ্বাকাশে ঘনীভবন হয়, তার ফলে মেঘের স্বষ্টি হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি যারা সম্ভব করেছে তারা অতি নগণ্য জিনিষ—বাতাসের ধূলা-বালি।

পানির পৃষ্ঠের সংস্পর্শে এসে জলীয়বাষ্পের অণু ঘনীভূত হতে পারে, তার কারণ সেখানে তারা ঘনীভূত হবার মতো একটা আশ্রয় পায়। এ আশ্রয় অন্য কিছুর পৃষ্ঠেও হতে পারে—যা পানির অণুকে আটকে রাখতে পারে। বাতাসের মধ্যে সেই অন্য কিছু হচ্ছে ধূলি-কণা। আপাতদৃষ্টিতে যতই অমলিন মনে হোক না কেন তার মধ্যে ধূলা-বালি, কল কারখানার ধোঁয়ার কণা, সমুদ্রের লবণ কণা ইত্যাদি বহু সূক্ষ্ম কণা ভাসছে। এরকম এক একটি সূক্ষ্ম কণাকে আশ্রয় করে শীতল বাতাস থেকে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হতে পারে একটি অতি ক্ষুদ্র জলবিন্দুর আকারে। এভাবে কেন্দ্রীয় একটি আঁটির মতো কাজ করে বলে এই ধূলিকণাকে বলা হয় ঘনীভবনের 'নিউক্লিয়াস'—ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ বীজ। আমরা একে বলবো ধূলি-বীজ।

ধূলি-বীজের উৎস

বাতাসে ধূলি-বীজ কোথা থেকে আসে তার কিছুটা আভাস আমরা ইতোমধ্যে পেয়েছি। বিষয়টি আরেকটু বিস্তৃত দেখা যাক। বাতাসে যখন ধূলা উড়ে তখন মাটি ও বালির সূক্ষ্ম কণা প্রচুর পরিমাণে বায়ুমণ্ডলে ঢোকে। যত রকম খোলা আগুন বা কল-কারখানায় দহনের কাজ আমরা করি তার সব কিছু থেকে অবশিষ্ট ধোঁয়া, ছাই কণা বহু ধূলি-বীজ হয়ে আকাশে যাচ্ছে। বড় বড় দাবানলগুলোর ভূমিকা এ-ক্ষেত্রে কম নয়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে প্রচুর ধূলি-বীজ সরা-সরি বাতাসে উৎক্ষিপ্ত হয়। আবার পৃথিবীর বাইরে থেকে আসা অসংখ্য সূক্ষ্ম উল্কা কণাও অবদান রাখছে তাতে।

বিভিন্ন ধূলি-বীজের মধ্যে লবণ কণার একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে—সংখ্যার দিক থেকে এবং গুণগত দিক থেকেও। সমুদ্রের ঢেউ যখন উপরের দিকে পানি ছিটিয়ে দেয়, তখন বাতাসে তার কিছু পানির তাৎক্ষণিক বাষ্পীভবন ঘটে। এর ফেলে যাওয়া লবণ কণাগুলো তখন বাতাসেই থেকে যায় ভাসমান ধূলি-বীজ রূপে। বৃষ্টির ফোঁটার সাথে প্রচুর ধূলি-বীজ আবার ভূ-পৃষ্ঠে ফেরৎ আসে। তাই নিত্য নূতন ধূলি-বীজ প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে সমুদ্র তল থেকে গড়ে প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ১000টি করে লবণের ধূলি-বীজ তৈরি হতে পারে এবং তা ঘাটতি পূরণের জন্য যথেষ্ট।

ঘনীভবনের জন্য উপযুক্ত ধূলি-বীজগুলোকে জলাসক্ত (হাইগ্রোসকো-পিক) কণাও বলা হয়, জলবিন্দুকে আশ্রয় দিতে তাদের প্রবণতার কারণে। লবণ কণার জলাসক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া যে সব ধূলি-বীজের জলবিন্দুতে দ্রবীভূত হবার গুণ রয়েছে সেগুলো বিশেষভাবে উপযোগী। এ রকম দ্রবণের ঘনীভবন যেহেতু

বিশুদ্ধ পানির চেয়ে সহজতর তাই এদের ওপর ঘনীভবনের জন্য এমনকি সম্পৃক্ত বাতাসেরও প্রয়োজন হয় না। যেমন এরকম ধূলি-বীজ লবণ কণার ক্ষেত্রে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৮% হলেই ঘনীভবন সম্ভব।

ধূলি-বীজগুলোর আকার নানা রকম হতে পারে—তবে সবই অতি সূক্ষ্ম, অদৃশ্য। খুব বড় ধূলি-বীজের ব্যাস এক সেন্টিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ হতে পারে। আবার খুব সূক্ষ্মগুলোর ব্যাস সেন্টি-মিটারের লক্ষ ভাগের এক ভাগ। এত ছোট জিনিস আমরা সাধারণত মাইক্রন অর্থাৎ সেন্টিমিটারের দশ হাজার ভাগের এক ভাগের এককে প্রকাশ করি। সে হিসেবে ধূলি-বীজের আকার দশ মাইক্রন থেকে দশভাগের এক মাইক্রনের মধ্যে। তাদের আশ্রয় করে গড়ে ওঠে যে জলবিন্দু তারও আকার খুবই ছোট—ব্যাস গড়পড়তা দশ মাইক্রনের মতো।

জলবিন্দু নিয়ে মেঘ

ঘনীভবনের ফলে উর্ধ্বাকাশে ক্ষুদ্র ধূলি-বীজকে কেন্দ্র করে যে ক্ষুদ্র জলবিন্দু গড়ে ওঠে তারা এতই হালকা যে অনায়াসে বাতাসে ভাসতে থাকে। এদের সমাবেশকেই আমরা বলি মেঘ। মেঘের মধ্যে জল-বিন্দুগুলোর পরস্পর দূরত্ব এক মিলিমিটারের মতো। এক ঘন সেন্টিমিটার আয়তনে এ রকম প্রায় হাজারটি জলবিন্দু থাকে। এভাবে দেখা যায় মেঘের আয়তনের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগই শুধু পানি, বাকি স্রেফ বাতাস। কিন্তু ঐ ফাঁক ফাঁক করে থাকা জলবিন্দুতে গড়া মেঘ তবুও আমাদের কাছে দৃশ্যমান। কারণ মোটামুটি পুরু একটি মেঘখণ্ডের মধ্য দিয়ে আসার সময় আলো জলবিন্দুগুলোতে শোষিত, প্রতিফলিত এবং প্রতিসরিত হয় বারবার। আলো বাধা পায় বলেই মেঘের অবয়ব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়।

মেঘের মধ্যে যে জলবিন্দু তার আকার নির্ধারিত হয় কি ভাবে? বিন্দুগুলো এমন ক্ষুদ্র থেকে যায় কেন? ব্যাপারটি পুরোপুরি বুঝতে এখনো আমাদের বাকি। দেখা গেছে জলবিন্দু একটু বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে তার উপর আরো ঘনীভবনের হার হ্রাস পায়। ঘনীভবনের সময় জলীয়বাষ্পের সুপ্ত তাপ যে বেরিয়ে পড়ে সে কথা আগেই বলেছি। জলবিন্দুর পৃষ্ঠদেশের আয়তন যত বড় হবে এই বেরিয়ে পড়া তাপ তত তাড়াতাড়ি বাতাসের মধ্যে যেতে পারবে। বাতাস তখন অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হয়ে ঘনীভবনের হার কমিয়ে দেবে। তা ছাড়া নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘনীভূত জলীয়বাষ্প অসংখ্য ধূলিবীজের মধ্যে ভাগ হয়ে যেতে হয় বলে এমনিতেই জলবিন্দুর আকারে একটা উর্ধ্ব সীমা এসে পড়ে। মেঘের জলবিন্দু তাই ক্ষুদ্রই থেকে যায়। বৃষ্টির সময় আরো অনেক বড় ফোঁটা যে গঠিত হয় সেটি অন্য ব্যাপার। তার কারণ পরে আমরা দেখবো।

মেঘের ভেতর বরফবিন্দু

মেঘ শুধু জলবিন্দুতেই তৈরি হবে এমন কথা নেই, তাতে বরফবিন্দুও থাকতে পারে। কোনো কোনো মেঘ তো শুধু বরফবিন্দুতেই তৈরি। পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠেই উত্তাপ বছরের দীর্ঘ সময় পানি জমাট বাঁধার সীমার (জমাটাঙ্ক) নীচে থাকে। আর উর্ধ্বাকাশে উঠলে তো সব জায়গাতেই এরকম শীতল বায়ুমণ্ডল পাওয়া সম্ভব। কিন্তু জমাটাঙ্কের নীচে শীতল হলেই উর্ধ্বাকাশে জলীয়বাষ্প জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হতে পারে না। তার জন্যও চাই উপযুক্ত আশ্রয় উপযুক্ত ধূলি-বীজ। বরফবিন্দুতে জমাট বাঁধার জন্য সেই ধূলি-বীজ হলেই চলে না, এর জন্য বিশেষ কিছু গুণ থাকা চাই। যতক্ষণ সে রকমটি না পাওয়া যাবে ততক্ষণ ঘনীভূত বাষ্প জমাটাঙ্কের নীচে শীতল হয়েও জলবিন্দুই থেকে যায়; বরফবিন্দু আর হয় না।

একে বলা হয় পানির অতি শীতল অবস্থা। উপযুক্ত ধূলি-বীজের সংখ্যা কম বলে মেঘের মধ্যে সাধারণত বরফবিন্দুর সংখ্যা কম। অতি-শীতল জলবিন্দুর উপস্থিতিটাই বেশি।

মেঘের মধ্যে অতিশীতল জলবিন্দুর উপস্থিতি অতীতে বিমান চলা-চলের ক্ষেত্রে বেশ বিপজ্জনক হতো। বিমানের কঠিন তলের সংস্পর্শে এসে এই অতি শীতল পানি জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হতে পারে। সেক্ষেত্রে ডানার অগ্র কিনারায় বরফ জমে তার আকৃতি পরিবর্তন, প্রপেলারে বরফ জমা প্রভৃতি ঝুঁকি দেখা দিতো। আজকাল অবশ্য বরফ গলাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে বিমানে।

সাধারণত অদ্রবণীয় ধূলি-বীজ যাকে বরফের কেলাস দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতে পারে তেমনটিই বরফবিন্দুর উপযুক্ত। কিন্তু এরা আবার জলবিন্দু জমার উপযুক্ত নয়। তাই একাংশ দ্রবণীয় একাংশ **অদ্রবণীয়** এমন ধূলি-বীজই বরফবিন্দুর কেন্দ্রে থাকতে পারে। দ্রবণীয় অংশ প্রথমে জলবিন্দু জমতে সহায়তা দেবার পর অদ্রবণীয় অংশ তাকে বরফ বিন্দুতে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। মাটি, বালি, কাদা ইত্যাদি সিলিকেটের কণা এ কাজের উপযোগী। মেঘের বরফবিন্দুর বিশ্লেষণ করে জৈব রাসায়নিক, এমন কি জীবাণুঘটিত ধূলি-বীজের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে।

আমরা যে সব রাশি রাশি
মেঘের পরশ ভেসে আসি
আমরা তারি খেয়াল তারি হে'য়ালি

মেঘ আর মেঘ

আকাশের দিকে তাকাবার অবসর যারই হয়েছে, তিনিই লক্ষ্য করে থাকবেন মেঘের কি বিচিত্র রূপ। এর পরিবর্তমান আকৃতি, আলো-আঁধারের লুকোচুরি, মাঝে মাঝে রঙের খেলা, কখনো দ্রুত কখনো মন্থর গতিশীতলতা সব মিলে আকাশে যে চিত্রকল্প স্থষ্টি হয় তা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি বড় অংশ। তাই কবি ও শিল্পীর অতি প্রিয় বিষয় মেঘ। আর তাই কালিদাস তাঁর দূতিয়ালীর কাজটুকু দিয়েছিলেন মেঘকেই। তবে কৃষক মেঘের দিকে তাকান বৃষ্টির সম্ভাবনা লক্ষ্য করতে আর বিমানের চালক তাকান তাঁর গতিপথ নির্বিঘ্ন কিনা দেখার জন্য। উভয়ের ক্ষেত্রেই মেঘের আচরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আসলে বিজ্ঞানীর কাছে মেঘের এই রূপবৈচিত্র্য এনে দিয়েছে, এখনো দিচ্ছে, ব্যাখ্যা করার মতো বহুতরো চ্যালেঞ্জ।

মেঘের শ্রেণী বিভাগ

মেঘের চেহারার উপর ভিত্তি করে তাকে খুব সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। সিরাস বা অলক মেঘ, স্ট্রেটাস বা স্তর মেঘ এবং **কিউমূ্যলাস** বা স্তূপ মেঘ।

আঁশের মতো ছড়ানো সরু সরু ফিতায় বিস্তৃত, দেখতে অনেকটা চুলের মতো বলেই অলক মেঘের এই নাম। এরা অতি উচ্চ আকাশের

মেঘ—অন্তত বিশ হাজার ফুট উপরেই। বাতাস সেখানে এত ঠাণ্ডা যে অলক মেঘ প্রায় সর্বাংশে জলবিন্দুর পরিবর্তে বরফবিন্দু দিয়েই গঠিত। তার চকচকে সাদা রেশমী চুলের চেহারাটা একারণেই। বরফবিন্দুর উপর বিক্ষিপ্ত আলোক ছটার জন্য এ মেঘের ধারগুলোও কেমন জানি একটু অস্পষ্ট, অন্য মেঘের মতো ভালোভাবে আঁকা নয়। জলবিন্দুতে আলোক শোষণের কারণে অন্যান্য মেঘের তলদেশটি দেখতে ধূসর অথবা কালচে হয়, কিনারা সাদা হলেও। কিন্তু অলক মেঘ এর ব্যতিক্রম। বরফবিন্দুতে আলোর প্রতিফলনে এর তলদেশকেও সাদাই দেখায়।

স্তর মেঘ সমভাবে বণ্টিত, স্তরে স্তরে রয়েছে এমনটি দেখায়। আকাশে যেন এরা একটা বিস্তৃত ধূসর রঙের আচ্ছাদন সৃষ্টি করে রাখে।

স্তূপ মেঘের উপরের দিকে ফেঁপে ওঠার প্রবণতা আছে। এভাবে উপরের দিকে গম্বুজের মতো ফুলে ওঠা, কিন্তু তলার দিকটা মোটামুটি চ্যাপ্টা—এমনিতরো মেঘই স্তূপ মেঘ। দেখতে মনে হয় যেন স্তূপ করে রাখা পঁ্যাজা তুলোয় গড়া এরা।

সব মেঘকে বিশুদ্ধভাবে এই তিন শ্রেণীর কোনো একটাতে পড়তে হবে, এমন কথা অবশ্য বলা যাবে না। অনেক মেঘের জন্য এদের দুটোকে মিশিয়ে যৌগিক নাম ব্যবহার করতে হয়। সাদা ও ধূসর রঙের মিশ্র কিছু মেঘ প্রায়ই সারা আকাশ ছেয়ে থাকে, যাকে বলা হয় স্তর-স্তূপ মেঘ (স্ট্রাটো কিউমুল্যাস)। অলক মেঘ বিস্তৃত হয়ে বড় আচ্ছাদন তৈরি করলে তাকে বলা হয় অলক স্তর (সিরোস্ট্রেটাস)। যে মেঘ থেকে শিগ্‌গির বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে তার নামের সাথে বাদল শব্দটা (ল্যাটিন প্রতিশব্দ **নিম্বাস**) লাগিয়ে দেয়া হয়। স্তর মেঘ থেকে বৃষ্টি আসন্ন হলে সেটাকে বলা হয় স্তর বাদল (নিম্বো-স্ট্রেটাস) অথবা স্তূপ মেঘ থেকে তা হলে সেটার নাম স্তূপ-বাদল

(**কিউমুলোনিম্বাস**)। কোনো কোনো মেঘ সাধারণত যে উচ্চতায় থাকে তার চেয়ে উঁচুতে বায়ুমণ্ডলে মাঝারি অবস্থানে থাকলে তাদের আগে (**মাঝারি**) কথাটা লাগিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে মাঝারি স্তর বা মাঝারি স্তূপ মেঘ হতে পারে।

কখন কোন মেঘ

আমরা দেখেছি কিভাবে বাতাস উপরে উঠে ঠাণ্ডা হয় প্রসারিত হয়ে পড়ার কারণে। এভাবে ঠাণ্ডা হয়ে শিশিরাঙ্কে বা তার কাছাকাছি উত্তাপে নেমে এলেই ঘনীভবন ও মেঘের সৃষ্টি হবার কথা। কিন্তু ঘনীভবনের সময় যে সুপ্ত তাপ বের হয়ে আসে সেটি বাতাসকে আবার খানিকটা উত্তপ্ত করে তুলতে পারে। আশে পাশের বাতাসের তুলনায় হালকা হয়ে এ বাতাস তখন আরো উপরে উঠতে পারে। ফলে আর এক দফা ঠাণ্ডা হবার পালা, যদিও উপরের দিকে উচ্চতার সাথে ঠাণ্ডা হবার হারটুকু কিছু কমে যায়।

বাতাস কিভাবে উপরে উঠছে, প্রবাহিত হচ্ছে তার উপরেই অনেকখানি নির্ভর করে কি রকম মেঘের সৃষ্টি হবে তা। ভূ-পৃষ্ঠ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম উত্তপ্ত হয়। এক এক জায়গায় গিয়ে তাই গরম ও ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে সাক্ষাত হয় বলা যায় একটা সীমান্ত সৃষ্টি হয় উভয়ের মধ্যে। সেই সীমান্তে ঠাণ্ডা বাতাসের অপেক্ষাকৃত হেলানো ঢালের উপর দিয়ে গরম বাতাস উপরে উঠে যায়। বাতাসের একটা বড় এলাকা জুড়ে এই উর্ধ্ব গতি ঘটে। এর ফলে প্রথমে সীমান্তের সামনের কিনারায় সুউচ্চে অলক মেঘের সৃষ্টি হয়। তারপর উষ্ণ সীমান্ত যতই এগুতে থাকে ততই অপেক্ষাকৃত নীচু মেঘ দেখা দেয়— অলকের বদলে মধ্য উচ্চতার স্তর অথবা স্তূপ মেঘ। এ অবস্থায় বায়ুমণ্ডল বেশ গরম ও আর্দ্র হয়ে উঠে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে।

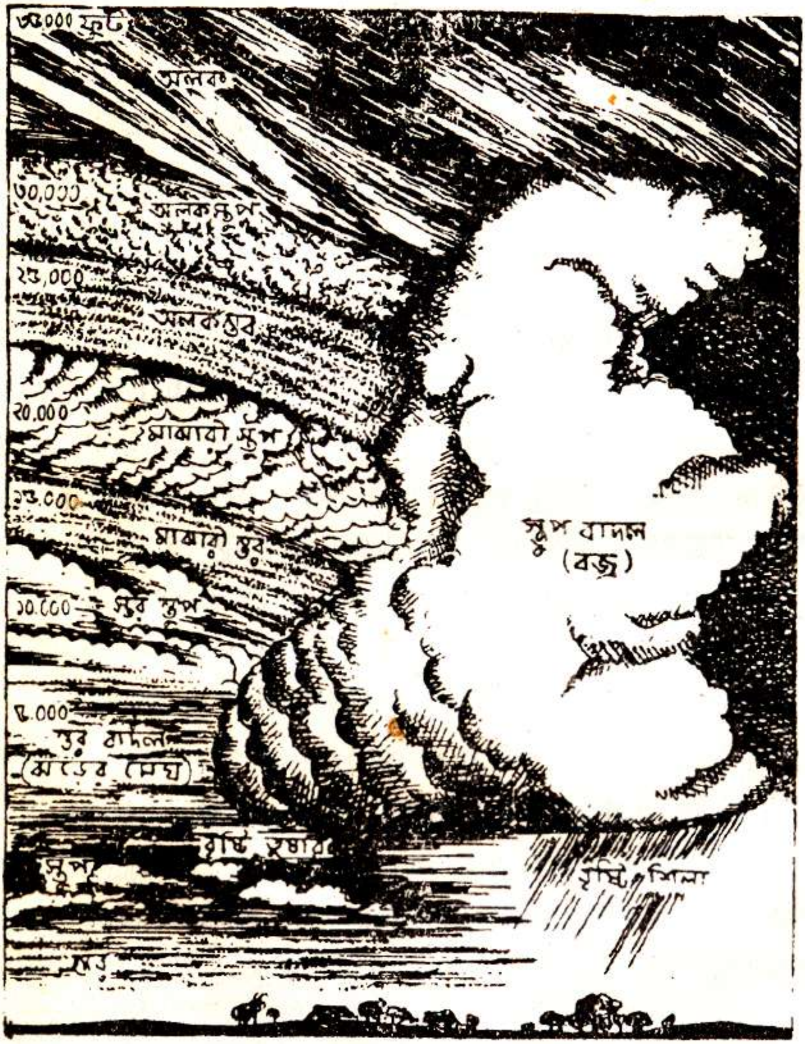

বিভিন্ন উচ্চতায় নানা মেঘের একটি সাধারণ বিন্যাস।

শেষপর্যন্ত উত্তপ্ত বাতাসের সীমান্ত কিনার ভূমির অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি এসে পৌঁছালে সেখানে দেখা দেয় নীচু স্তর-বাদল মেঘ। এই মেঘের ভারি কালচে স্তর থেকে একটানা বৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

উত্তপ্ত বাতাসের উপরে উঠে যাওয়ার আর একটি ভঙ্গী আছে। সেটি স্থানীয়ভাবে পরিচলনের মাধ্যমে সোজা—উপরে ওঠা। এতে একটা জায়গার পুরো এলাকার বাতাস সাধারণত এক সাথে উপরে ওঠে না। উত্তপ্ত হবার উপর নির্ভর করে খণ্ড খণ্ড এক একটি অঞ্চলের বাতাস আলাদাভাবে উপরে উঠে যেতে বাধ্য হয়। উপরে উঠে এর থেকে মেঘ সৃষ্টি হতে পারে। উপরে ওঠার গতি যদি অব্যাহত থাকে তা হলে সে মেঘ দেখা দেয় পুরু স্তূপ মেঘ হিসেবে। তবে এ রকম উঠতি বাতাসে সব সময়ই যে স্তূপ মেঘ সৃষ্টি হবে এমন কথা নেই—উত্তাপ, আর্দ্রতা সব একই থাকা সত্ত্বেও। সেটা কেন দেখা যাক।

অপেক্ষাকৃত নীচের বায়ুমণ্ডল উপরে উঠার সময় বাতাসের উত্তাপ প্রতি কিলোমিটারে ১০^{0} সে: করে হ্রাস পায়। ঘনীভবনের সুপ্ত তাপ বেরিয়ে আসার কারণে আবার উত্তপ্ত হলে উর্ধ্বাকাশে প্রতি কিলো-মিটার ওঠার জন্য এবার ৬^{0} সে: করে উত্তাপ হ্রাস পেতে থাকে। এভাবে ক্রমাগত উর্ধ্বগতি বজায় থাকলে অনেক দূর পর্যন্ত বাতাস এক রকম বিচলিত অবস্থায় থাকে। সে ক্ষেত্রে উঁচু হয়ে ওঠা স্তূপ মেঘ সৃষ্টি সম্ভব হয়। অপরপক্ষে কোনো অঞ্চল থেকে উঠে যাওয়া বাতাস যদি ঘনীভবনের কারণে উষ্ণতর হয়ে আরো উপরে উঠতে চেষ্টা করে কিন্তু আশে পাশের বাতাসও সমান উষ্ণতায় থাকে বলে তাদের উপর টেক্কা দিয়ে উঠতে পারে না। তখন তা সেখানেই অবিচলিত হয়ে স্থিতি লাভ করে। এরকম অবস্থায় ওখানেই অপেক্ষাকৃত কম পুরু কিন্তু বড় এলাকায় বিস্তৃত স্তর মেঘের সৃষ্টি হয়।

স্বাভাবিক পরিষ্কার আবহাওয়ায় যে স্তূপ মেঘ সৃষ্টি হয় তা সাদা নিখুঁত প্যাঁজা তুলার মতো দেখতে। কিন্তু খুব গরম আর্দ্র দিনে কখনো কখনো সোজা ক্রমাগত উঠতে থাকা জোরালো বাতাসের কারণে

স্তূপ মেঘ অসম্ভব ফেঁপে ফুলে উঠতে পারে—খুব নীচু থেকে খুব উঁচু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে। পাশাপাশি ছয় মাইল বিস্তার আর ছয় সাত মাইল উচ্চতা এ ধরনের মেঘের জন্য স্বাভাবিক আকার। এর নীচু তলদেশটি বেশ ঘন কালো হয়ে দেখা দেয়। শিগগির বজ্র-বিদ্যুতের ঘনঘটায় এখান থেকে প্রচুর বর্ষণ ঘটে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবশ্য এ সবের অবসান হয়, মেঘও কেটে যায়। এই ব্যতিক্রমী মেঘকে বলা হয় স্তূপ-বাদল (**কিউমুলো** নিম্বাস), সংক্ষেপে বজ্র মেঘ। বজ্রের আলোচনায় এর সাথে আবার আমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে।

হাতের কাছে মেঘ ঃ কুয়াশা

কুয়াশা ভূমির কাছাকাছি সৃষ্টি হওয়া স্তর-মেঘ বৈ আর কিছু নয়। কাজেই মেঘ কি জিনিস তাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে হলে, অনুভব করতে হলে কুয়াশার মধ্যে গেলেই যথেষ্ট। শীতের রাতে ভূমি যখন দ্রুত শীতল হয়ে পড়ে তখন ভূমির সংস্পর্শে এসে কাছাকাছি বাতাসও শীতল হয়। ও-সময় বাতাসের চলাচল বেশি না থাকলে শীতল বাতাসটুকু ওখানেই থেকে যায়। উত্তাপ শিশিরাঙ্ক বা তার কাছাকাছি নেমে এলেই বাতাসের জলীয়বাষ্প ধূলি-বীজের গায়ে ঘনীভূত হয়ে জলবিন্দু গঠন করে। এভাবে সৃষ্টি হয় কুয়াশা।

ধূলি-বীজের জলাসক্তি সম্পৃক্তির আগেই ঘনীভবন ঘটাতে সাহায্য করে। মাটির ধূলি কণা, কল-কারখানা, গাড়ির ধোঁয়া কণা, লবণ-কণা সব রকমের ধূলি-বীজই এখানেও কার্যকর। এদের সংখ্যা বেশি হলে কুয়াশা জমার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। যেমন ঘন শিল্প এলাকার কাছে ধোঁয়ার আধিক্যের কারণে কুয়াশা বেশি হতে পারে। তা ছাড়া ওটা বেশ ময়লাটে কুয়াশা বলে তার অস্বচ্ছতাও অধিক হয়। খুব জোরালো বাতাস নীচের ঠাণ্ডা বাতাসকে এলোমেলো করে গরম

বাতাসের সাথে মিশিয়ে ফেলতে পারে বলে তা কুয়াশা সৃষ্টির জন্য সহায়ক নয়। কিন্তু মৃদু-মন্দ বাতাস বইলে সেটা বরং উপরের আরো বাতাস ঠাণ্ডা করে কুয়াশাকে পুরু করে। সকালে সূর্যের তেজ বাড়ার পর বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে নাড়া খায়; তখন গরম বাতাসের সংস্পর্শে এসে অবশেষে কুয়াশার জলবিন্দু বাষ্পীভূত হয়, কুয়াশা কেটে যায়।

তাপ বিকিরণে ভূমি শীতল হয়ে যে কুয়াশা সৃষ্টির কথা বলা হলো তার নাম বিকিরণ কুয়াশা। এ ছাড়া অন্যভাবেও কুয়াশার সৃষ্টি হতে পারে। শীতল স্রোত ইত্যাদির কারণে সমুদ্রের পানি ঠাণ্ডা হলে তার ওপর কুয়াশা জমতে পারে (এডভ্যাকশন ফগ)। অথবা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় গরম পানির পৃষ্ঠ থেকে ভাপের মতো কুয়াশা উঠতে পারে যেমনটি ফুটন্ত পানির কেতলির মুখে দেখা যায়। এ রকম কুয়াশাকে বলা হয়, ভাপ কুয়াশা (ষ্টিম ফগ)। বাদলা দিনে ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্য দিকে অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর বৃষ্টিপাত হলে এ রকম কুয়াশা দেখা দিতে পারে।

যে মেঘ বর্ষালোনা

এ বইয়ে মেঘের অবতারণা করা হচ্ছে প্রধানত জলীয়বাষ্প আর বৃষ্টির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র হিসেবে। কিন্তু মেঘ মাত্রই বৃষ্টিদায়ি নয়। অনেক মেঘের জলবিন্দু বৃষ্টিতে অধঃক্ষিপ্ত হতে পারার আগেই আবার জলীয়বাষ্প হয়ে উঠে যায়। সার্বিক একটি গড় নেয়া হলে দেখা যায়—যে কোনো সময় পৃথিবীর উপরিভাগের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মেঘে ঢাকা থাকে। কিন্তু তার মধ্যে মাত্র শতকরা তিন ভাগ থেকে বৃষ্টি তুষার ইত্যাদি রূপে অধঃক্ষেপণ ঘটে। কাজেই এটি মেঘের বড় পরিণতি নয়, বরং একটি ব্যতিক্রম।

অবশ্য যে মেঘ বর্ষালোনা তার কোনো গুরুত্ব নেই একথা ঠিক নয়। বর্ষণের কথায় যাওয়ার আগে এখানে সে-গুরুত্বগুলো খানিকটা দেখার চেষ্টা করা যাক। আমাদের জলবায়ুর ওপর মেঘের প্রভাবের একটি কারণ সূর্যের নানাবিধ বিকিরণের প্রতিফলন, শোষণ ও নিঃসরণে মেঘের ক্ষমতা। বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণের জন্য এ-ক্ষমতা বিভিন্ন রকমের। সূর্য কিরণের যতটুকু দৃশ্যমান আলো মেঘ তার ভাল প্রতিফলক। তাই শতকরা ৮০ ভাগ দৃশ্য আলোকে প্রতিফলিত করে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দেয় মেঘ। আমরা এ কারণে মেঘকে ধূসর দেখলেও একই কারণে নভোচারীরা মেঘকে দেখতে পান আয়নার মতো চকচকে সাদা। যেটুকু আলো এভাবে ফেরৎ যায়না তারও অধিকাংশ শোষিত হয়ে পড়ে মেঘের পুরু অবয়বের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে। মেঘ তাই ভূপৃষ্ঠ থেকে সূর্যালোক ঠেকিয়ে রাখতে পটু।

সূর্যের বিকিরণ শোষণ করে ভূমি পরে যে দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অদৃশ্য তাপ রশ্মি নিঃসরণ করে তা কিন্তু মেঘের মধ্যে প্রায় পুরাপুরি শোষিত হয়ে যায়। এর জন্য খুব পুরু মেঘ স্তরেরও প্রয়োজন হয় না। এই তাপ আবার মেঘ থেকে **পুনঃনিঃসরিত** হয় তার উষ্ণতা অনুসারে এভাবে মেঘের নিঃসরিত তাপ রাতের বেলায় ভূ-পৃষ্ঠে আবার ফিরে আসতে পারে। এমনি করে সূর্যের বিকিরণ ঠেকিয়ে মেঘ যেমন ভূমিকে বেশি উত্তপ্ত হতে দেয় না, তেমনি আবার তাপ ফিরিয়ে দিয়ে তাকে বেশি ঠাণ্ডাও হতে দেয় না। এ যেন এক প্রাকৃতিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কায়দা। এভাবে মেঘের আচ্ছাদনটি না থাকলে পৃথিবী সূর্য তাপের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির কারণে বড় বেশি অসহায় হয়ে পড়তো।

বিন্দু থেকে বিকশিত

নামার আগে

'চল নামি'—বলছে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় আকাশের জলবিন্দুরা। কথাটার মধ্যে রীতিমতো একটি যোগসাজশের আভাস আছে। বৃষ্টি নামার আগে ঐ যোগসাজশটা যে বড়ই জরুরী এ কথা বিজ্ঞানীরাও বেশ বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু হাজার তদন্তেও তার স্বরূপটা ধরা পড়ছিলো না।

মেঘের মধ্যে ক্ষুদ্র যে জলবিন্দু বাতাসের বাধা ঠেলে তার নীচে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। নামার আগে তাকে আরও বড় হয়ে পরিণত হতে হবে বৃষ্টির ফোঁটায়। কিন্তু কত বড় হলে চলবে? হিসেব করে দেখা গেছে ১০ মাইক্রন ব্যাসার্ধের একটি জলবিন্দুর পড়ার গতি হবে সেকেণ্ডে ০.৩ সেন্টিমিটার। এই গতিতে এক কিলোমিটার উপরের একটি মেঘ থেকে তার পড়তে ৫ দিন লেগে যাবে। আগেই দেখেছি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘনীভূত পানি মেঘের মধ্যে অসংখ্য ধূলি-বীজে ভাগ হয়ে যায় বলে প্রত্যেকটি জলবিন্দুর আকার এত ক্ষুদ্র। ধরা যাক পানির পরিমাণ কোনো কৌশলে ৮ গুণ বাড়ানো গেলো, অথবা ধূলি-বীজের সংখ্যা ৮ গুণ কমানো গেলো। তা হলে জলবিন্দুর ব্যাসার্ধ বাড়বে মাত্র ২ গুণ, আর এর ফলে তার পড়ার গতিবেগ বাড়বে ৪ গুণ। কাজেই এত করেও বৃষ্টিপাতের কোনো সুরাহা হয় না।

স্পষ্টত এমন কোনো জবরদস্ত প্রক্রিয়া থাকতে হবে যার মাধ্যমে মেঘের জলবিন্দুর এক লক্ষটি কি তারো চেয়ে বেশি একত্র হতে পারে এক একটি ফোঁটায়!

জলবিন্দু বিকশিত হয়ে বৃষ্টির ফোঁটা রূপে পড়াটাকে আবহাওয়াবিদরা বলেন অধঃক্ষেপণ (প্রেসিপিটেশন)। আসলে শুধু বৃষ্টির ফোঁটা কেন অন্য যে কোনো রূপ নিয়ে পড়লেও বলা হয় অধঃক্ষেপণ—শিলা, তুষারকণা যাই হোক না কেন। যখন এদের সবগুলোর জন্য কোনো কথা প্রযোজ্য তখন অনেক সময় বৃষ্টি না বলে অধঃক্ষেপণই বলা হয়। এই অধঃক্ষেপণের ব্যবস্থাটি না থাকলে কি ভয়াবহ ব্যাপার ঘটতো ভেবে দেখা যাক। বায়ুমণ্ডল সর্বত্র পানিতে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতো, আকাশ সব সময় ঢাকা থাকতো মেঘে। সূর্যালোক বড় একটা পৌঁছতো না পৃথিবীতে, নতুন করে বাষ্পীভবনও হতোনা। এরকম অবস্থায় পৃথিবীতে জীবন ধারণটা কি ভাবে চলতো? তাই ঐ যে জলবিন্দুরা বলছিলো 'চল নামি'—তাদের সে যোগসাজশটা খুবই জরুরী নয় কি?

কিছু বাতিল তত্ত্ব

অধঃক্ষেপণের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যার এমন বহু চেষ্টা আগে হয়েছে যেগুলো শেষপর্যন্ত সন্তোষজনক হয়নি। তবুও প্রচেষ্টাগুলো শিক্ষণীয়। এক সময় মনে করা হয়েছে জলবিন্দুগুলোর বিভিন্নতায় হয় ধনাত্মক নয় ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ থাকে, আর বিপরীত ধর্মের চার্জের আকর্ষণের ফলে এরা পরস্পরের সাথে যুক্ত হতে থাকে। কিন্তু পরে বোঝা গেছে যে জলবিন্দুর চার্জ বৈষম্য যা হতে পারে, আর বিন্দুগুলোর মধ্যে দূরত্ব মেঘে যা হয়ে থাকে তাতে অতখানি আকর্ষণের সম্ভাবনা নেই।

আর একটি তত্ত্বে মনে করা হয়েছিলো যে অপেক্ষাকৃত বড় জলবিন্দুগুলো ধীরে ধীরে আরো বড় হতে থাকে। তাদের বাড়তি পানির যোগান আসে ছোট জলবিন্দুগুলো চুপসে গিয়ে। কিন্তু পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে মেঘের মধ্যে ছোট বড় জলবিন্দুর বণ্টন সব সময় মোটামুটি একই থাকে। গড়পড়তা জলবিন্দু থাকে ১০ থেকে ১৫ মাইক্রন ব্যাসার্ধের মধ্যে, খুব অল্প কিছু ৪০ মাইক্রনের মতো। এর বিশেষ হেরফের হতে দেখা যায় না।

অন্য এক ব্যাখ্যা খাড়া করা হয়েছিলো উত্তাপের সাথে বাতাসের সম্পৃক্তির পরিবর্তনকে ভিত্তি করে। বাতাসের বিচলনের ফলে গরম ও ঠাণ্ডা জলবিন্দু পরস্পর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলে গরম জলবিন্দু থেকে বাষ্পীভূত হয়ে পানি ঠাণ্ডা জলবিন্দুর উপর জমার প্রবণতা দেখা দেবে। এর কারণ গরম জলবিন্দুর প্রেক্ষিতে বাতাস এখনো সম্পৃক্ত নয়, অথচ ঠাণ্ডা জলবিন্দুর প্রেক্ষিতে একই বাতাস ইতিমধ্যে অতিসম্পৃক্ত। এভাবে কিছু জলবিন্দু অন্যগুলোর বিনিময়ে বড় হতে থাকবে। কিন্তু দেখা গেছে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে মেঘের জলবিন্দুর উত্তাপ কখনোই এত উপরে যেতে পারে না যে এই ব্যাখ্যা কার্যকর হতে পারে।

আর একটি তত্ত্ব খাড়া হয়েছিলো বাতাসের অতিকায় কিছু ধূলিবীজের অস্তিত্বকে আশ্রয় করে। বলা হয়েছে অপেক্ষাকৃত অনেক বড় এসব ধূলিবীজের উপর বৃষ্টির ফোঁটা জমে ওঠে। এটা সত্যি যে বড় ধূলি-বীজে শুরুতে ঘনীভবন দ্রুততর হয়। কিন্তু জলবিন্দুর সীমাবদ্ধকারী কারণগুলো শিগ্‌গির এখানেও কার্যকর হয় আর এর বৃদ্ধি শেষ হয়ে যায় বৃষ্টির ফোঁটার আকারে পেঁছার অনেক আগেই।

তত্ত্বগুলো এভাবে একের পর এক ব্যর্থ হচ্ছিলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত দুটি ব্যাখ্যা সফল হয়েছে অধঃক্ষেপণের প্রকৃত বর্ণনা দিতে। এবার একে একে এদের দেখা যাক।

বরফ কেলাসের মধ্য-সত্তা

তিরিশের দশকে সুইডিশ আবহবিদ বের্গেরসন ও জার্মান পদার্থবিদ ফিনডাইসেন লক্ষ্য করেছিলেন যে বরফ কেলাসের কাছাকাছি অতি শীতল জলবিন্দু থাকলে বেশ খানিকটা পরিবর্তন সূচিত হয়। এতে জলবিন্দুর গা থেকে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বরফ কেলাসের গায়ে গিয়ে তা জমাট বাঁধার প্রবণতা দেখা দেয়। এমন অবস্থায় জলবিন্দু ধীরে ধীরে উঠে যায়, আর তার বিনিময়ে বরফ কেলাসের কলেবর বৃদ্ধি ঘটে।

অধিকাংশ বাদল মেঘই উপরের দিকে যে উচ্চতায় বিস্তৃত থাকে সেখানে বেশ কিছু বরফ-বিন্দু থাকা স্বাভাবিক। অবশ্য অতি শীতলতা সত্ত্বেও উপযুক্ত ধূলি-বীজের অভাবে সেখানে জলবিন্দুর তুলনায় বরফ বিন্দুর সংখ্যা লাখে একটিও হবে না। তবুও ঐ অল্প সংখ্যক বরফ বিন্দুই এমন প্রভাব বিস্তার করে যে তার আশপাশের অনেকগুলো জলবিন্দু উবে গিয়ে এই বরফ-বিন্দুকে বড়সড় একটি বরফ কেলাসে পরিণত করে। এমন বরফ কেলাস স্বাভাবিক ভাবেই নীচের দিকে দ্রুত নামতে পারে। নামার সময় এরা আরো জলবিন্দু অথবা অন্যান্য আরো বরফ কেলাসকে আত্মস্থ করে বৃহত্তর হতে থাকে।

আবহাওয়া যদি নীচের দিকে ভূমি পর্যন্ত খুব শীতল থাকে তা হলে ঐ পড়ন্ত বরফ কেলাস শেষপর্যন্ত চিলতে বরফ রূপেই পড়বে তুষারপাতে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেঘ ত্যাগের সময় বরফ থাকলেও পড়ার এক পর্যায়ে গরম বাতাসের সংস্পর্শে এসে এরা গলে

যায়। এরপর বৃষ্টির ফোঁটার আকারে পানি হিসেবেই এরা পড়ে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে বলতে হয় যে সমস্ত বৃষ্টির প্রথম পর্যায় কাটে তুষার হিসেবে।
তত্ত্বটি নানাভাবে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। পর্বতারোহণ অথবা বিমান ভ্রমণের সময় প্রায়শ দেখা যায় যে উপরে যখন তুষার-পাত হচ্ছে নীচে তখন চলছে বৃষ্টিপাত। অনেক পুরু হবার কারণে বজ্রমেঘকে খুব উঁচু থেকে খুব নীচু পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের সুযোগ থাকে। সেখানে দেখা যায় বৃষ্টিপাতের ঠিক পূর্বক্ষণে এর উচ্চতম স্থানে আঁশ সদৃশ ও ঈষদচ্ছ ভাবের সৃষ্টি হয়—যা বরফের লক্ষণ। আর সমস্ত বজ্র মেঘ জুড়ে এ সময় হঠাৎ করে প্রচুর তুষারপাত ও ও বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যায়। এ সব থেকে বোঝা যায় যে, মেঘ থেকে বৃষ্টি সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বরফের মধ্য সত্তাটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখন এটি স্বীকৃত যে উষ্ণ অঞ্চলীয় বৃষ্টিপাত ছাড়া পৃথিবীর আর প্রায় সব বৃষ্টিপাত এভাবেই ঘটে থাকে।

পড়ন্তি ধাক্কায় কুড়িয়ে নিয়ে

উষ্ণ আবহাওয়ায় যে বৃষ্টিপাত সেখানে বরফ কেলাসের ভূমিকা থাকার সম্ভাবনা কম। এখন মনে করা হয় যে ওখানকার বড় বড় ফোঁটার ঝমঝম বৃষ্টি পড়ন্ত জলবিন্দুর সাথে অন্য জলবিন্দুর সংঘর্ষ ও সম্মিলনেরই ফল। মেঘের মধ্যে কিছু জলবিন্দু যদি পড়ার মতো আকার ধারণ করে তা হলে পড়ার পথে এরা অপেক্ষাকৃত মন্থর অথবা স্থির, ক্ষুদ্রতর জলবিন্দুগুলোকে ধাক্কা দিয়ে আত্মস্থ করবে।
প্রক্রিয়াটি শুরু করার জন্য অবশ্য ন্যূনতম ১৯ মাইক্রন ব্যাসার্ধের প্রয়োজন হবে। কিছু অতিকায় ধূলি-বীজের কারণে এ রকম বড় জলবিন্দু সৃষ্টি হতে পারে। মেঘের উপরের দিকে অল্প কিছু বরফ কেলাস

থাকলে এদের কারণেও কিছু বড় জলবিন্দু সৃষ্টি হয়ে প্রক্রিয়াটি শুরু করতে পারে। এরা পড়তে আরম্ভ করলেই সংঘর্ষ ও সম্মিলন দ্রুত আরো বড় ফোঁটার সৃষ্টি করে। বাতাসের বিচলন বিজলীর পতন ইত্যাদিও সহায়তা করতে পারে এ রকম সংঘর্ষে।

ফোঁটা যত বড় হবে পড়তি ধাক্কায় জলবিন্দু কুড়াবার ক্ষমতাও তার ততই বেশি হবে। কাজেই ফোঁটার কলেবর গুণোত্তর হারে বেড়েই চলবে। প্রতি নির্দিষ্ট সময় অন্তর দ্বিগুণ হতে থাকবে ফোঁটার ভর। হিসেব করে দেখা গেছে যেই মেঘের ঘনত্ব এক ঘনমিটারে এক গ্রাম তাতে বৃষ্টির ফোঁটা ২৫ মিনিটে দ্বিগুণ ভারি হবে। এভাবে ১২ মাইক্রনের একটি জলবিন্দু ১২০ মাইক্রনের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটায় পরিণত হতে হলে তার ভর বাড়তে হবে ১000 গুণ অর্থাৎ ভরকে ক্রমান্বয়ে দ্বিগুণ হতে হবে ১0 বার। এতে সময় লাগবে ২৫0 মিনিট বা প্রায় ৪ ঘণ্টা। এই বৃষ্টির ফোঁটাকে ঝমঝম বৃষ্টির ফোঁটায় পরিণত হতে হলে তাকে আরো হাজার গুণ ভারি হতে হবে—সময় লাগবে আরো ৪ ঘণ্টা। মেঘটি যদি ফোঁটার ৮ ঘণ্টা ধরে পড়তে পড়তে বড় হবার মতো পুরু না হয় তাহলে এটি সম্ভব নয়। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় কেন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিপাতের জন্যও বাদল মেঘকে অন্তত এক কিলোমিটার পুরু হতে হয়। আরো বোঝা যায় কেন যথেষ্ট পুরুত্ব লাভ করার পরেও অন্তত আধ ঘণ্টা অতিবাহিত না হলে বৃষ্টিপাত শুরু হতে পারে না। পড়তি ধাক্কায় জলবিন্দু কুড়াতে কুড়াতে ফোঁটা যথেষ্ট পুষ্ট হবার জন্য এই সময়টুক প্রয়োজন।

সিক্ত তোমার জটাজূট হতে
সলিল পড়িছে ঝরিয়া
বাহির হইতে ঝড়ের আঁধার
আনিয়াছে সাথে করিয়া
তাপস মূরতি ধরিয়া

অধঃক্ষেপণের নানা রূপ

বৃষ্টির ফোঁটা

আমাদের জন্য অধঃক্ষেপণের সব চেয়ে জরুরী রূপটি হলো বৃষ্টি। বিভিন্ন মৌসুমে বা বিভিন্ন মাসে কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হচ্ছে, গড়ে কি রকম হয় এসব খবর খুব গুরুত্বপূর্ণ—আবহবিদের কাছে এবং সেই সাথে সবার কাছে। বৃষ্টির মোট পরিমাপটি আসে বৃষ্টির পানি কোনো দিকে নষ্ট না হয়ে ভূমিতে জমলে কতখানি উচুঁ হয়ে দাঁড়াতো সেই মাপ থেকে। বৃষ্টি মাপক যন্ত্র পানিকে এভাবে ধরে রাখার একটি পাত্র বই কিছু নয়। পরিমাপের এককটি দৈর্ঘ্যের একক—সেন্টিমিটার অথবা ইঞ্চি।

এক এক পশলা বৃষ্টির তীব্রতা কি রকম জলতত্ত্বের আলোচনায় সে খবরটাও জরুরী। তীব্রতা মানে হলো একক সময়ের মধ্যে কতখানি বৃষ্টিপাত হলো তা। আমরা সাধারণত গুঁড়ি গুঁড়ি, হালকা, মাঝারি কিংবা ভারি বৃষ্টি ইত্যাদি বলে এই তীব্রতাকে প্রকাশ করি। বৃষ্টি তীব্রতর হওয়াটা নির্ভর করে ফোঁটা কত বড় তার ওপর, ফোঁটা কতগুলো তার ওপর তেমন নয়। ফোঁটার আকারের একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করা যাক।

আগেই আমরা দেখেছি বাতাসে ক্ষুদ্রতর ধূলি-বীজগুলোর ব্যাস $\frac{1}{10}$ মাইক্রনের মতো, আর তথাকথিত 'অতিকায়' ধূলি-বীজগুলোর

ব্যাস ১০ মাইক্রনের মতো'ই। মনে রাখা দরকার যে মাইক্রন হলো এক সেন্টিমিটারের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ। মেঘের জলবিন্দুগুলোর গড়পড়তা ব্যাসও ১০ মাইক্রনের মতোই। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টিপাতে যে অতি ছোট ছোট ফোঁটা পড়ে তার ব্যাস প্রায় ১০০ মাইক্রন। আর যাকে আমরা বলি হালকা বৃষ্টি তার ফোটার ব্যাস ১০০০ মাইক্রন বা ১ মিলিমিটারের মতো। এ রকম বৃষ্টির তীব্রতা সাধারণত ঘণ্টায় ১মিলিমিটার অর্থাৎ এক ঘণ্টা বৃষ্টি হলে তার ফলে ১ মিলিমিটার পানি জমার কথা। আর খুব ভারি এক পশলা বৃষ্টিতে যেখানে তীব্রতা ঘণ্টায় ১০ সেন্টিমিটার—সেখানে ফোঁটার ব্যাস ৩ মিলিমিটারও হতে পারে। অবশ্য যে কোনো বৃষ্টিতেই নানা আকারের কিছু ফোঁটা থাকতে পারে। এখানে শুধু অধিকাংশ ফোঁটার কথা বলা হচ্ছে।

অধঃক্ষেপণে বৃষ্টির ফোঁটা তৈরি হবার যে ব্যাখ্যা আমরা দেখেছি তাতে ফোঁটা আরো বড় হতে পারতো। কিন্তু বড় ফোঁটার ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনাও বেশি। পড়ার সময় এর ভেতরে পানির অভ্যন্তরীণ বিচলন ভেঙ্গে পড়ার অন্যতম কারণ। সব তরলের পৃষ্ঠদেশের অণুগুলো টান টান চামড়ার মতো এক ধরনের টানের সৃষ্টি করে সেখানে—যাকে বলা হয় পৃষ্ঠ টান (সারফেস টেনশন)। পানির ফোঁটাকে গোলগাল আকৃতিতে ধরে রাখার দায়িত্ব পৃষ্ঠ টানের এই অদৃশ্য মোড়কের ওপর ফোঁটার ব্যাস ৩ মিলিমিটারের বেশি হয়ে যাবার পর তার ভেঙ্গে পড়ার প্রবণতা যে হারে বাড়ে পৃষ্ঠ টান সেভাবে বেড়ে তাকে সামাল দিতে পারে না। ফলে এর চেয়ে বড় ফোঁটাগুলো ভেঙে গিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ফোঁটায় পরিণত হয়।

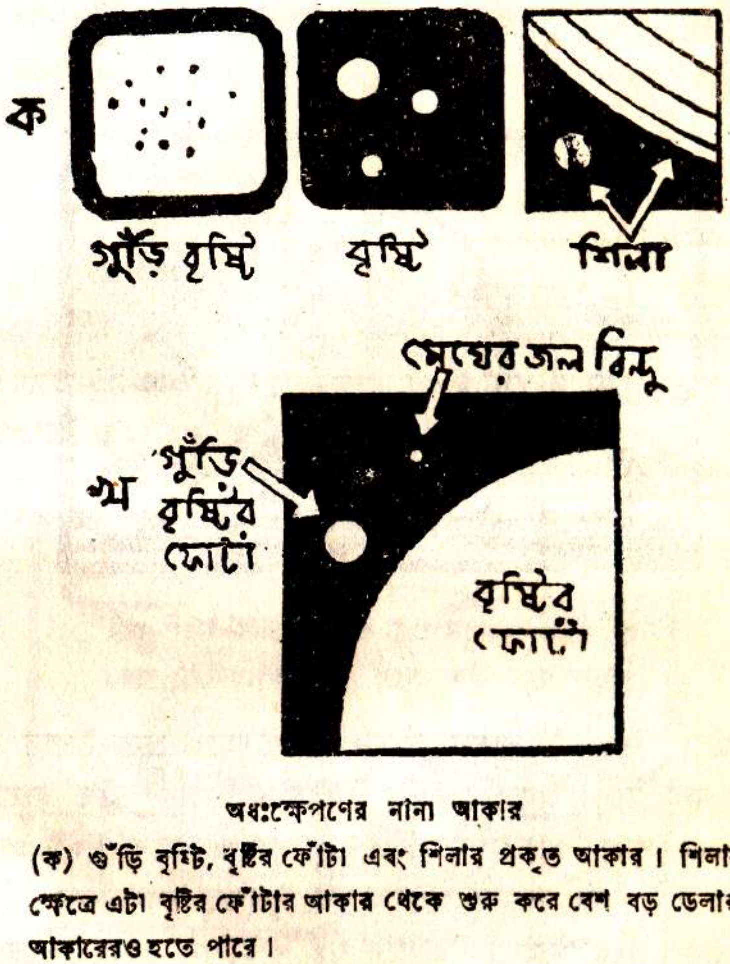

অধঃক্ষেপণের নানা আকার

(ক) গুঁড়ি বৃষ্টি, বৃষ্টির ফোঁটা এবং শিলার প্রকৃত আকার। শিলার ক্ষেত্রে এটা বৃষ্টির ফোঁটার আকার থেকে শুরু করে বেশ বড় ডেলার আকারেরও হতে পারে।

(খ) মেঘের জলবিন্দু, গুঁড়ি বৃষ্টি ও বৃষ্টির ফোঁটার তুলনামূলক আকার (অনেক গুণে বিবর্ধিত)।

খাড়া পরিচলনে অধঃক্ষেপণ

অধঃক্ষেপণের পূর্বশর্ত হচ্ছে আর্দ্র বাতাসের উপরে ওঠা এবং শীতল হয়ে যথেষ্ট স্থায়ী ঘনীভবনের সৃষ্টি। এভাবে আর্দ্র বাতাসের ঊর্ধ্বগতির **ভঙ্গীর** উপর অধঃক্ষেপণের প্রকৃতি অনেকটা নির্ভর করে।

পরিচলনের ফলে উত্তপ্ত বাতাসের সোজা উপরে উঠে যাওয়া এই ভঙ্গীগুলোর অন্যতম।

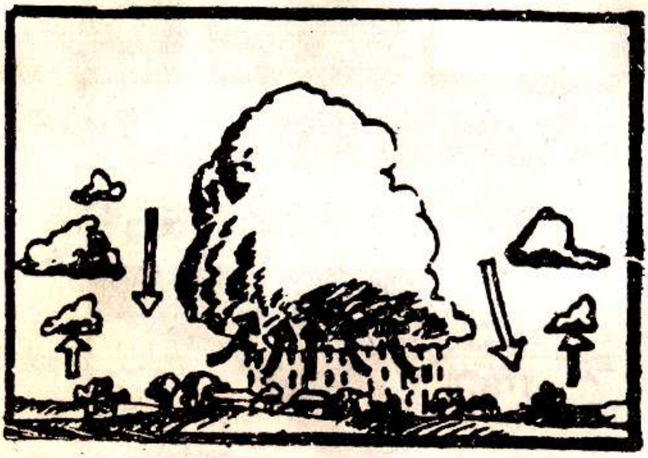

পরিচলনে অধঃক্ষেপণ: স্থানীয় ভাবে উত্তপ্ত হয়ে বাতাস যখন নিজ থেকে খাড়া উপরে উঠে যায়।

স্থানীয়ভাবে একটি এলাকার বাতাস উত্তপ্ত হয়ে দ্রুত উপরে উঠে গেলে বলা হয় সেখানে একটি পরিচলন কোষ গঠিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ঘন গাছপালায় ভর্তি অঞ্চলের মাঝখানে একটি জায়গা বৃক্ষহীন নগ্ন হয়ে থাকলে আশপাশের তুলনায় সেখানকার বাতাস বেশি উত্তপ্ত হয়ে পড়বে। এখানে সৃষ্ট পরিচলন কোষ উপরে স্তূপ মেঘের সৃষ্টি করতে পারে। সীমিত আকারের এ রকম পরিচালন কোষ সাধারণত অবিচল প্রকৃতির ঘনীভবন সৃষ্টি করে এবং তা থেকে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম। কিন্তু এর মধ্যেই বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই স্তূপ মেঘে বড় রকমের একটা তোলপাড় সৃষ্টি হতে পারে। সে মেঘ তখন ফুলে ফেঁপে স্তূপ বাদল বা বজ্র মেঘে পরিণত হয় এবং প্রচুর অধঃক্ষেপণ ঘটায়। স্বল্পস্থায়ী ভারি বৃষ্টিপাত ছাড়াও এ

থেকে শিলাবৃষ্টিও হতে পারে। এ রকম অবস্থা সাধারণত কাছাকাছি কয়েকটা পরিচলন কোষ নিয়ে সৃষ্টি হয়।

পরিচলন-জনিত অধঃক্ষেপণের বৈশিষ্ট্য হলো সীমিত স্থানে, সীমিত সময়ে স্বল্প স্থায়ী অঝোর বৃষ্টি এর থেকে সম্ভব।

ঘূর্ণিঝড়ে অধঃক্ষেপণ

কাল বৈশাখীই হোক কি অন্য যে কোনো ঘূর্ণিঝড়ই হোক ঝড়ের সাথে বৃষ্টিও মোটামুটি অবধারিত। এ-রকম অধঃক্ষেপনের মূলে কারণ যেটি থাকে সেটি হলো বাতাসের নিম্নচাপ অবস্থা। নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে

বায়ু সীমান্তে অথবা ঘূর্ণিঝড়ে অধঃক্ষেপণ: শীতল বাতাসের সীমান্তের চাল যখন একটা কীলকের মতো গরম বাতাসকে উপরে তুলে আনে।

চারদিক থেকে বাতাস ধাবিত হয় বলে সেখান থেকে নীচের উত্তপ্ত বাতাস দ্রুত উপরে উঠে যায়। কখনো এ সময় গরম ও ঠাণ্ডা বাতাসের সাক্ষাৎ স্থলে ঠাণ্ডা বাতাসের বাধা গরম বাতাসকে উপরে উঠতে

সাহায্য করে। এ সবের ফলশ্রুতি দেখা দেয় চলমান ঘূর্ণিবাত্যা এবং বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ক্রমাগত অধঃক্ষেপণ।

উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে সমুদ্রের ওপর প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে এরা সাইক্লোন, হারিকেন, টাইফুন ইত্যাদি নামে পরিচিত। এদের সাথে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়াটাও স্বাভাবিক ঘটনা।

পর্বতারোহণে অধঃক্ষেপণ

বায়ু প্রবাহের সামনে যদি কোনো পর্বত পড়ে তাহলে এর ঢাল বেয়ে বাতাসকে উপরে উঠতে হয়। উপরে উঠে যথারীতি শীতল হতে পারে বলে পর্বতের নিকট ঢালে অধঃক্ষেপণ ঘটার এটি একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে নিয়মিত ঘটতে থাকলে এ রকম বৃষ্টিপাতের

পর্বতারোহণে অধঃক্ষেপণ : সামনে পর্বতের বাধা বাতাসকে যখন উপরে উঠতে বাধ্য করে।

সমষ্টি বেশ বড় রকমের হয়ে দাঁড়াতে পারে। বাতাসের পর্বতারোহণের নানারকম কিছু ফলশ্রুতি হতে পারে।

১. পর্বত ঢালের নানা অঞ্চলে নানারকম উত্তাপ থাকলে এর উপর দিয়ে যাবার সময় বাতাসে বেশ খানিকটা বিচলনের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

২. নিম্নচাপ কেন্দ্র সহজে সরে যাবার প্রবণতা থাকলে ঘূর্ণিঝড়ে অধঃক্ষেপণ কম হয়। কিন্তু পর্বতের উপস্থিতি কেন্দ্রের চলাফেরায় বাধা দেয় এবং অধঃক্ষেপণ বাড়ায়।

৩. দুই পর্বতের মাঝখানে উপত্যকা অনেকটা ফানেল বা চোঙের মতো বাতাসকে কেন্দ্রীভূত করে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সবের প্রভাবে পর্বত ঢালে বা তার কাছাকাছি ভারি বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি হয়। আবার উর্ধ্বগামী বাতাসের সাথে পর্বত ঢালের ঘর্ষণে অনেক সময় এ বাতাস বেশ ঘূর্ণিত হয়ে পড়তে পারে। এর ফলে ব্যাপ্ত স্তর মেঘ বা স্তর স্তুপ মেঘ সৃষ্টির সুবিধা হয়। এ রকম অবস্থায় হালকা অধঃক্ষেপণই শুধু আশা করা যায়। পর্বতের গায়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, হালকা পাঁজা তুষার এ-সবই এর লক্ষণ।

শিলাবৃষ্টি

বৃষ্টিপাত ছাড়া অধঃক্ষেপণের আর দুটোরূপ আমরা খানিকটা আলোচনা করবো—শিলাবৃষ্টি এবং তুষারপাত। এরা উভয়েই বরফরূপে অধঃ-ক্ষেপণ। এর মধ্যে শিলাবৃষ্টি তার ক্ষতিকর দিকের কারণে মাঝে মাঝে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তুষারপাত যদিও আমাদের দেশে ঘটে না তবুও অধঃক্ষেপণের পরিমাণের দিক থেকে দুনিয়াতে এর স্থান বৃষ্টিপাতের পরেই।

পরিচলন অধঃক্ষেপণেরই একটি ব্যতিক্রমী ফসল হলো শিলাবৃষ্টি। বজ্রমেঘ যখন ফুলে ফেঁপে প্রচুর উঁচু হয়ে ওঠে আর তার মধ্যে—৫° সে. থেকে—২০° সে. পর্যন্ত নিম্ন উত্তাপের সৃষ্টি হয় তখন এতে শিলা

তৈরি হতে পারে। বজ্র মেঘের সাথী জোরালো উর্ধ্বমুখী বায়ুর ওপর ভেসে থেকেই শিলা বড় হতে থাকে। মেঘের মধ্যে বড় বরফ বিন্দু অথবা ইতোমধ্যে সংগঠিত বরফ কণা নিচে পড়ার সময় অতি শীতল জলবিন্দু কুড়িয়ে নিয়ে একটি শিলার সূত্রপাত ঘটাতে পারে। জলবিন্দুগুলো শিলার গায়ে জমাট বাঁধতে থাকে আর সেই সাথে সুপ্ত তাপ নিঃসৃত করে শিলাকে কিছুটা উষ্ণতর করে তোলে। মেঘের মধ্যে তার গতি বৈচিত্র্য এবং এই তাপ উৎপাদনের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে শিলার আকার ও আকৃতি।

শিলা দেখতে সাদা অস্বচ্ছ যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে বেশ স্বচ্ছ। মাঝখানে ভেঙে ফেললে দেখা যায় কিভাবে সমকেন্দ্রিক বিভিন্ন স্তরে এটা গড়ে উঠেছে। স্বচ্ছতার পার্থক্যের কারণেই স্তরগুলোকে আলাদা করা যায়। স্বচ্ছতাটা আসলে নির্ভর করে বরফের মধ্যে বায়ু বুদবুদের সংখ্যার ওপর। এই স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করে শিলার পূর্ব ইতিহাস অনেকখানি আন্দাজ করা যায়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় স্তরগুলো পরপর যুক্ত হয়েছে শুধু এক দিকে আর তার ফলে শিলার আকৃতি হয়েছে খানিকটা শঙ্কুর (কোণ) আকৃতির। এর থেকে বোঝা যায় শিলাটি বড় হবার সময় তার একটা দিক সব সময় নিচের দিকেই ছিলো, জলবিন্দু কুড়িয়ে নিয়ে ঐ দিকটাতেই শুধু কলেবর বেড়েছে। অপেক্ষাকৃত বড় শিলা আবার খানিকটা গোলগাল চেপ্টা আকৃতি পায়। এর স্তরগুলো সাধারণত ঢেউ খেলানো এবং চারদিকে মোটামুটি সমানভাবে বিস্তৃত হয়। দেখে আন্দাজ করা যায় এ শিলাগুলো ডিগবাজী খেতে খেতে বড় হয়েছে, কাজেই সব অংশই পালাক্রমে নিচে এসেছে। এক একটি স্তরের স্বচ্ছতার পরিমাণও শিলার জন্ম ইতিহাসকে আরো খানিকটা বলে দিতে পারে। যেখানে অতিশীতল জলবিন্দু শিলার গায়ে আঘাত পাবার

সঙ্গে সঙ্গে জমে বরফ হয়েছে সেখানে এর গোল আকৃতিটা বদলানোর সময় পায়নি। এ রকম অনেকগুলো ক্ষুদ্র গোলককে নিজের গায়ে ঠাসাতে গিয়ে শিলার মধ্যে রয়ে গেছে বাতাসের অনেক বুদবুদ। এর ফলে এখানে শিলা বেশ সাদা, অস্বচ্ছ। আবার কোনোখানে আঘাতের সময় জলবিন্দু শিলার গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এটা ওখানে অংশত

অপেক্ষাকৃত বড় আকারের শিলার প্রস্থচ্ছেদে স্তরবিন্যাস দেখা যাচ্ছে।

জমাট বাঁধতে না বাঁধতেই তার ওপরে এসে পড়েছে আরো জলবিন্দুর ছড়ানো পানি। শিলার এ রকম বৃদ্ধিকে তাই ভেজা বা স্পঞ্জ সদৃশও বলা হয়। এতে বুদবুদের সংখ্যা কম থাকে বলে এ-অঞ্চল অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ।

শিলার ধাত্রী হলো জোরালো উর্ধ্বমুখী বাতাস। এ বাতাস তাকে ওপরে মেঘের মধ্যে ভাসিয়ে রাখে, আপেক্ষিকভাবে উঠতে নামতে দেয় এবং এ সময় শিলার কলেবর যথেষ্ট বেড়ে উঠতে পারে। অবশেষে এক পর্যায়ে উর্ধ্বমুখী বাতাস থেকে মুক্ত হয়ে শিলা ভূমিতে এসে পড়ে। পড়ার গতি দ্রুত বলে প্রচুর দূরত্ব অতিক্রম করার সময় এর বরফ খুব একটা গলে না।

তুষারপাত

তুষারের সৃষ্টি কিভাবে হয় তা আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি অধঃক্ষেপণে বরফের মধ্য সত্ত্বার আলোচনায়। শেষপর্যন্ত বরফ হিসেবে থাকতে পারলে এটা ভূমিতে বরফ হিসেবেই পড়ে তুষারপাতে। তুষারে বরফের

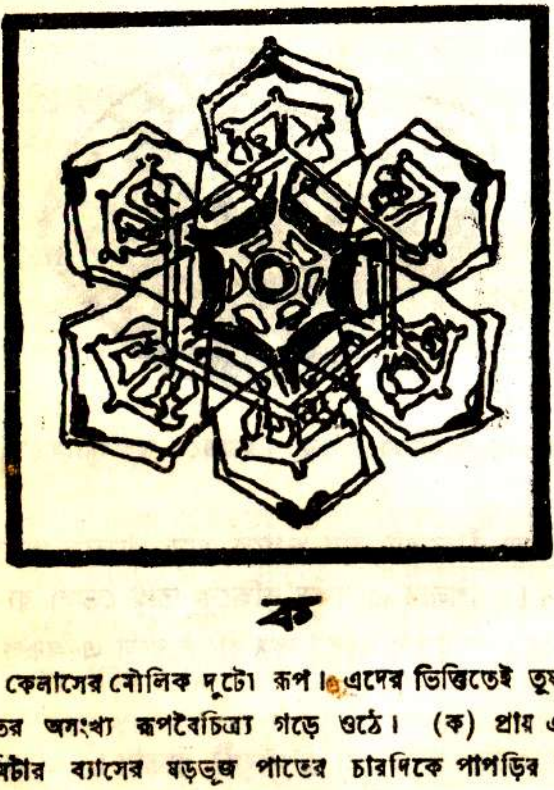

ক

তুষার কেলাসের মৌলিক দুটো রূপ। এদের ভিত্তিতেই তুষার চিলতের অসংখ্য রূপবৈচিত্র্য গড়ে ওঠে। (ক) প্রায় এক মিলিমিটার ব্যাসের ষড়ভূজ পাতের চারদিকে পাপড়ির মত প্রসার।

কেলাস গঠন নির্ভর করে তার উত্তাপের উপর ও বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণের উপর। মোটের ওপর এরা পাতলা চিলতের আকারে অথবা সূঁচালো প্রিজমের আকারে বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় আকৃতিটা মিশ্র প্রকৃতিরও হতে পারে। বরফের কেলাসে অণুর বিন্যাস

ষড়ভূজাকৃতি বলে তুষারের মধ্যে প্রায়ই ছয়ের প্রতিসাম্য থাকে। এর ফলে খুব সুন্দর নানারকম ফুলের চিলতের আকৃতিতে তুষারকে দেখা যায়। বিশেষকরে তুষার যদি শুষ্ক থাকে তা হলে এই আকৃতিগুলো অবিকৃত দেখা যায়। কিন্তু পড়ার পথে অপেক্ষাকৃত গরম বাতাসের

(খ) ছয় রশ্মিবিশিষ্ট তারকাকৃতির কেলাস।

সাক্ষাতে তুষার অংশত গলে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাওয়া যায় আর্দ্র-তুষার—যাতে বরফ কিছুটা তালগোল পাকিয়ে আকৃতি হারাতে পারে।

মেঘ ত্যাগের পর তুষার যদি গরম বাতাসের সংস্পর্শে সম্পূর্ণ গলে যায় এবং ভূমির কাছাকাছি এসে আবার ঠাণ্ডা বাতাসে পুণঃকেলাসিত হয় তখন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বরফপাত ঘটে। এক্ষেত্রে বরফ ছোট ছোট দানার আকারে পড়ে এবং তাকে বলা হয় স্লীট।

যে শাখায় ফুল ফোটেনা, ফল ধরেনা একেবারে
তোমার ঐ বাদল বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে

বৃষ্টি অনাবৃষ্টি

পানির কিছু মোদ্দা হিসাব

ভূপৃষ্ঠের পানি থেকে মেঘ হয়ে আবার অধঃক্ষেপণের মাধ্যমে পানি— এই পুরো কাহিনী আমাদের দেখা হয়ে গেছে। এর একেবারে শুরুতেই একটা হিসাব পেয়েছিলাম ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বছরে গড়ে মোট ১২৪,০০০ ঘন মাইল পানি আকাশে যাচ্ছে, স্থল থেকে ১৫০০০ এবং সমুদ্র থেকে ১০৯,০০০ ঘন মাইল। বাতাসে আর মেঘে সাময়িকভাবে জমা থাকলেও এ পানির পুরোটাকেই আবার ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসতে হয় বৃষ্টি বা তুষাররূপে। স্থলভাগ থেকে যত পানি ওঠে এটা ফেরৎ পায় তার চেয়ে বেশি। এর কারণ অধঃক্ষেপণের সুযোগ স্থলভাগের ওপরেই বেশি। স্থলের ওপর পড়ে ২৬,০০০ ঘন মাইল পানি আর সমুদ্রের উপর বাকি ৯৮,০০০ ঘন মাইল। এভাবে প্রতি বছর স্থলভাগে ১১,০০০ ঘন মাইল বাড়তি পানি আসছে, অধঃক্ষেপণের ফলে এলেও যার উৎস সমুদ্র। এই বাড়তি পানিকে কোনো না কোনোভাবে সমুদ্রে ফেরত যেতে হয়, নইলে দুনিয়াতে পানির ভারসাম্য থাকতো না। এ পানি নদী নালার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে অথবা অন্তঃসলিলের আকারে ভূগর্ভের ভেতর দিয়ে সমুদ্রে ফেরত যায়।

জলচিত্রে বৈচিত্র্য

বৈচিত্রের শুরু বাষ্পীভবন থেকেই। বাষ্পীভবনের প্রধান শর্তগুলো কি কি দেখা যাক। ভূ-পৃষ্ঠে পানি থাকতে হবে, এর উপরের বাতাস ইতোমধ্যেই সম্পৃক্ত হয়ে থাকা চলবেনা, আর বাষ্পীভবনের জন্য উত্তাপের যোগান থাকতে হবে। এ সব শর্ত পূরণের ব্যবস্থা স্থলে একরকম, আবার সমুদ্রে অন্যরকম। স্থলের পৃষ্ঠদেশে পানি থাকতেও পারে—খাল-বিল, নদী-নালা, গাছ-পালা, আর্দ্র মাটি ইত্যাদিতে, আবার নাও থাকতে পারে মরুভূমির মত অবস্থায়। স্থলে উত্তাপ ধরে রাখার ব্যবস্থা ভালো নয়, যতক্ষণ সূর্য-কিরণ ততক্ষণই বাষ্পীভবন। শীত প্রধান অঞ্চলে শুধু গ্রীষ্মকালেই সূর্যের প্রখরতা বাষ্পীভবনের জন্য যথেষ্ট হয়, অন্য সময় নয়। তাই স্থলের বহু জায়গাতেই বাষ্পী-ভবনে নানা সীমাবদ্ধতা।

সমুদ্রে এ সব সীমাবদ্ধতা কম। পানির অভাব তো নেই, সূর্যের কিরণও পানির ভেতরে বেশ খানিকটা প্রবেশ করে পানির উত্তাপের আকারে দীর্ঘতর সময় সঞ্চিত থাকতে পারে। এর ফলে এখানে প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন বাষ্পীভবন সম্ভব। একটা সীমাবদ্ধতা অবশ্য রয়েছে, তা হলো সমুদ্রের পানির উপরের বাতাস আর্দ্র ও সম্পৃক্ত হবার প্রবণতা।

বাষ্পীভবন কোনো এক জায়গায় বেশি হচ্ছে তার মানে অবশ্য এই নয় যে সেখানে অধঃক্ষেপণও বেশি হবে। পৃথিবী পৃষ্ঠে এই উভয়ের বণ্টন খুব একটা এক রকম নয়। বায়ু প্রবাহে আর্দ্র বাতাসের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হবারও একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে এতে। উদাহরণস্বরূপ বৃষ্টি প্রধান বহু অঞ্চলের অধঃক্ষেপণ অনেকাংশে বাণিজ্য বায়ু অথবা মৌসুমী বায়ু প্রবাহে সমুদ্র থেকে যাওয়া পানির কারণে ঘটে। অবশ্য আর্দ্র বাতাস শুধু গেলেই হবে না তার থেকে অধঃক্ষেপণ সৃষ্টির উপায়ও থাকতে হবে। এখানেও

প্রচুর রূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়। খাড়া পরিচলনে বজ্র-বৃষ্টিতে, নিম্নচাপে ঘূর্ণিঝড়ে, পর্বতারোহণে ইত্যাদি নানাভাবে এটা ঘটতে পারে। বৃষ্টি সৃষ্টিকারী এসব অবস্থার সুযোগ অনুসারে পৃথিবীর নানা জায়গায় বৃষ্টি-অনাবৃষ্টির নানা অঞ্চল দেখা যায়। এখানে আমরা শুধু তার মধ্যে বৈশিষ্ট্যময় কয়েকটি উদাহরণের আলোচনা করতে পারি।

বৃষ্টি যেখানে দৈনিক

নিরক্ষরেখার দুপাশে বেশ কিছু এলাকা আছে যাকে আর্দ্র নিরক্ষীয় অঞ্চল বলা হয়। এখানে বৃষ্টিপাত এতই প্রচুর এবং এতই নিত্য নৈমিত্তিক যে বলা যায় যেন প্রতি দিন ঘড়ি ধরা নিয়মে এখানে বৃষ্টি হয়। নিরক্ষীয় পুরো অঞ্চলটা এর মধ্যে পড়ে না, কারণ স্থানীয় নানা বৈশিষ্ট্য, পাহাড় পর্বতের অবস্থান ইত্যাদির প্রভাবে অন্য রকম অবস্থাও সৃষ্টি হয়। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, কঙ্গো, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান অববাহিকা—ইত্যাদি অঞ্চলের এই আর্দ্র নিরক্ষীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রতিদিন বৃষ্টিপাতের প্রায় নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী এখানে সম্ভব। সকাল খানিকটা এগোলে তেতে-ওঠা সূর্য আগের দিনের জমে থাকা বৃষ্টির পানিকে বাষ্পীভূত করে ফেলে। সৃষ্টি হয় নতুন করে স্তূপ মেঘ। দুপুর হতে হতে উত্তাপ আরো ৮-১০° ডিগ্রি সে. বাড়ে। বাতাসের আর্দ্রতাও বেশ অনুভূত হয়। এতক্ষণ যা ছিলো গো-বেচারা স্তূপ মেঘ এখন তা দ্রুত ঘন-ঘটার বজ্র মেঘে রূপ নেয়। বিকেল তিনটার দিকে উত্তাপ ও আর্দ্রতা অসহ্য হয়ে ওঠে। ওদিকে আকাশ কালো হয়ে আসে ফেঁপে ওঠা মেঘের আচ্ছাদনে। বিকেল পাঁচটার দিকে নামে আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি। যেভাবে হুড়মুড় করে দ্রুত এটা আসে সেভাবে দ্রুত শেষও হয়ে যায় দু'এক ঘণ্টার

মধ্যে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়, বাতাসও বেশ ঠাণ্ডা ও শুষ্ক হয়ে আরামপ্রদ বোধ হয়।

এ অঞ্চলে ঋতু বৈচিত্র্য বড় একটা নেই। সামান্য ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে ঘটলেও বৃষ্টিপাতের দৈনিক ধরনটা গড়পড়তা সবদিনই এ-রকম থাকে। এসব অনেক অঞ্চলে উত্তাপ আর বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্টি হয়েছে গহীন ঘন অরণ্য। প্রবল বৃষ্টিতে মাটির উর্বরতা ধুয়ে গিয়ে এখানকার অনেক অঞ্চল শস্য চাষের উপযুক্ততা হারিয়েছে। বৃষ্টি যে সব সময় মানুষের আবাদযোগ্য ভূমি বাড়ায় তা কিন্তু ঠিক নয়।

বাদলা হাওয়ার মৌসুমী

বাংলাদেশে বর্ষা আসে মৌসুমী বাতাসের সাথে। এ বাতাস পরিবর্তিত হয় ঋতু পরিবর্তনের সাথে – তাই এই নাম। প্রায় বার শ বছর আগে কালিদাস উত্তর ভারতের রামটেকে (নাগপুরের কাছে) বাদলা মৌসুমী আগমনের দিন-ক্ষণটিকে চিহ্নিত করেছিলেন—'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'। মনে হয় মৌসুমীর আনাগোনার প্যাটার্নে আজও বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি।

মৌসুমী প্রবাহের পেছনে যে প্রভাব কাজ করে তা অনেকটা একটা তাপ-ইঞ্জিনের মতো। মধ্য এশিয়ার বিশেষ করে তিব্বতের মালভূমির বিস্তীর্ণ স্থলভাগের সাথে ভারত মহাসাগর আর প্রশান্ত মহাসাগরের তাপ পার্থক্যের কারণেই এর সৃষ্টি। ভারত উপমহাদেশের উত্তর ভাগে প্রচুর ঘনীভবনের কারণে যে বিপুল পরিমাণ সুপ্ত তাপ বাতাসে নিঃসরিত হয় তাও এই পার্থক্যকে আরো তীব্র করে তোলে। তাপ পার্থক্যে যে বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি হয় পৃথিবীর আবর্তনের প্রভাবের সাথে মিলে এটা নিম্নবায়ুমণ্ডলে পশ্চিমা বাতাস আর উচ্চ বায়ুমণ্ডলে পুবালী

বাতাস দিতে থাকে। এই মৌসুমী প্রবাহে যথেষ্ট বিচলন আর অস্থিতির উপাদান থাকে বলে এটা প্রায়ই নিম্নচাপ অঞ্চলের সৃষ্টি করে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

গ্রীষ্মের একেবারে গোড়ার দিকেই বাংলাদেশে কিছু বৃষ্টির পালা শুরু হয়ে যায়। সেই সাথে ভারতের আসামে ও বার্মার কিছু জায়গাতেও বৃষ্টি নামে। উত্তরে পর্বতের উপস্থিতি তখন ঊর্ধ্বস্তরের বায়ুকে অপসারী হয়ে ছড়িয়ে পড়তে এবং নিম্নস্তরের বায়ুকে অভিসারী হয়ে অল্প জায়গায়

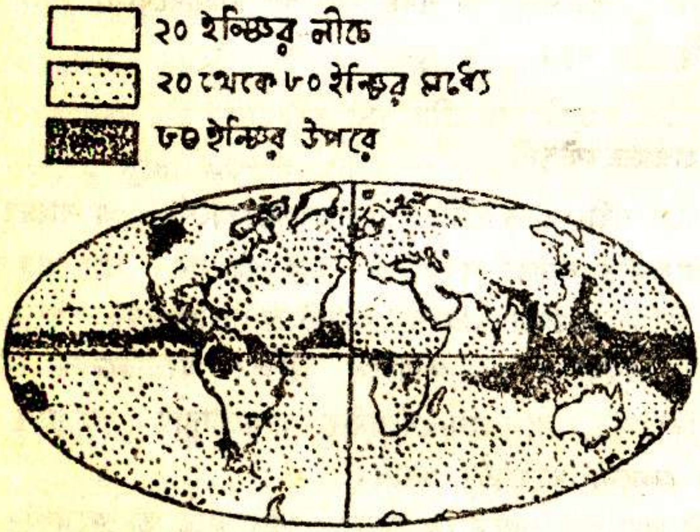

পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের কেলাস

কেন্দ্রীভূত হতে সাহায্য করে। এ রকম অবস্থায় বজ্র বৃষ্টি স্বাভাবিক। তাছাড়া এ সময় বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে উৎপন্ন নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবও এ অঞ্চলে বৃষ্টি আনতে সাহায্য করে। তারপর আসে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বাদলা হাওয়ার ভরা মৌসুমী, শুরু হয় বর্ষা। ভারত উপমহাদেশসহ এশিয়ার আরো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয়। তবে বষ্টিপাতের প্যাটার্নটি সর্বত্র এক নয়।

ভূমির চড়াই উৎরাই এবং এদের ঢালের অভিমুখ মৌসুমী বায়ুর প্রভাবকে স্থানীয়ভাবে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আসামে খাসিয়া পাহাড় অঞ্চলে এটা খুব স্পষ্ট দেখা যায়। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা মৌসুমী বায়ুর অংশ বিশেষ এখানে দক্ষিণের নিম্ন সমভূমি তারপর ক্রমাগত উচ্চতর ভূমি ও অবশেষে খাড়া চড়াই এই ফানেল-সদৃশ ভূমি ব্যবস্থার ওপর দিয়ে চালিত হয়। এর ফলে যে অধঃক্ষেপণ ঘটে তা একে দুনিয়ার সবচেয়ে অধিক বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের অন্যতম করে তুলেছে। এখানকার চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়—গড়ে বছরে ১১৪৪ সেন্টিমিটার। জায়গাটা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৩৪০ মিটার উচ্চে।

বৃষ্টিহীন নিদারুণ খরা

অনেকদিন ধরে বৃষ্টিপাত নগণ্য হলে ভূমির আর্দ্রতা শুকিয়ে যেতে থাকে। যে আর্দ্রতা বাষ্পীভবনের ফলে মাটি থেকে চলে যায় অধঃ-ক্ষেপণে তা ফেরত না আসাটা যদি নিয়মে দাঁড়িয়ে যায় তা হলে এটা ঘটতে পারে। ভূমি তার সম্পূর্ণ আর্দ্রতা হারিয়ে ফেললে বাষ্পীভবনও বন্ধ হয়ে যায়। এরপর কালে-ভদ্রে বৃষ্টি হলেও ঐ ক্ষতি আর সহজে পোষানো যায় না। অনেকক্ষেত্রে স্থানগুলো মরুভূমিতে পরিণত হয়।

মরুভূমি অঞ্চলে যেটুকু বৃষ্টিপাত হয় তা সাধারণত খাড়া পরিচলন বায়ুর মাধ্যমেই হয়। ফলে এর প্রকৃতি হয় স্থানীয় গোছের। এক জায়গায় হয়তো মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হয়ে গেলো, দু মাইল দূরে অন্য জায়গায় তার কিছুই টের পাওয়া গেলো না। তার মধ্যে আবার উচ্চ পাহাড়ী এলাকা থাকলে বৃষ্টির সিংহভাগ চলে যায় সেখানে। উপত্যকা ও সমভূমিতে খরা অব্যাহত থাকে।

দীর্ঘস্থায়ী খরা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল হতে পারে। এর ওপর নানারকম প্রভাব কাজ করতে পারে। এদের মধ্যে রয়েছে—

১. সংশ্লিষ্ট নাতিশীতোষ্ণ উচ্চচাপ অঞ্চলের বিস্তার কোনো এলাকাকে অধঃক্ষেপণের স্বাভাবিক সম্ভাবনাগুলো থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

২. মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সনাতন নিয়মে কোনো কারণে ব্যতিক্রম দেখা দিলে সময়মতো যেটুকু আর্দ্র বাতাস এসে অধঃক্ষেপণের সূচনা করতে পারতো তা আর ঘটে না।

৩. স্রোতের পরিবর্তনে নিকটবর্তী সমুদ্রের উত্তাপ হ্রাস পেলে তার ওপর দিয়ে আসা বাতাসের আর্দ্রতা হ্রাস পায়। এর প্রভাবেও কোনো অঞ্চলে খরা সৃষ্টি হতে পারে। এরকম বহু প্রভাব খরার জন্য দায়ি হতে পারে।

আফ্রিকায় সাহারার দক্ষিণ কিনারা ধরে মৌরিতানিয়া থেকে চাদ অবধি যে বিশাল অঞ্চল সাহেল নামে পরিচিত সেখানে সত্তরের দশক থেকে চলছে এক মর্মান্তিক খরা। এটা পরে বিস্তৃত হয়েছে সুদান আর ইথিওপিয়াতে। এই খরার কারণ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কিছু ঘটনাকে উল্লেখ করা হয়। ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ উচ্চচাপ অঞ্চলের দক্ষিণ ও পূর্ব অভিমুখে বিস্তার এর মধ্যে একটি। আর একটি কারণ হতে পারে উত্তর আটলান্টিকের পূর্ব এলাকায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উত্তাপ হ্রাস। পরিবেশগত আর যে-কারণটি প্রায়ই উল্লেখিত হয় তা হলো ব্যাপকভাবে উদ্ভিদের বিনাশ। এই বিশাল অঞ্চলের মানুষের একটি প্রধান জীবিকা পশু চারণ। বেপরোয়াভাবে পশু চারণের ফলে এখানকার তৃণভমি নষ্ট হয়ে গেছে। যে হারে তৃণ শেষ হয়েছে সে হারে তাকে গজাবার সুযোগ দেয়া হয়নি। ফলে তৃণহীন নগ্ন ভূমি সূর্য-কিরণ শোষণ করার বদলে একে প্রতিফলনে ফেরত পাঠিয়ে

দিয়েছে বেশি। এ রকম অবস্থা অধঃক্ষেপণের পরিমাণ গুরুতরভাবে কমিয়ে দিতে পারে। এটা স্পষ্ট যে এ-ধরনের বেশ কিছু কারণের সম্মিলিত অশুভ যোগ এই বিস্তীর্ণ ও ভয়াবহ খরার সৃষ্টি করেছে। এ রকম খরার সাথে আসে দুর্ভিক্ষ আর মৃত্যুর পদধ্বনি। আফ্রিকার ব্যাপক অঞ্চল এমনি এক নিদারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে।

ইচ্ছে হলেই বৃষ্টি

যথাসময়ে পরিমিত বৃষ্টি মানুষের কাছে যে কত মূল্যবান সে কথা বর্ণনার অবকাশ রাখে না। তাই কৃষক আর পশুপালক অধীর আগ্রহে আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির প্রার্থনা করেছে সব যুগে সবখানে। যে বৃষ্টি নামতে চাচ্ছে না তাকে নামাবার জন্য সাধ্য সাধনাও বিচিত্র রকমে হয়েছে। এ সব প্রধানত রূপ নিয়েছে তুক্‌তাক যাদুমন্ত্রের। এ কাজের জন্য বহু সমাজেই বৃষ্টি নামাতে পারদর্শী মন্ত্রবিদদের বেশ চাহিদা দেখা গেছে। এ শুধু তথাকথিত অনুন্নত সনাতনী সমাজগুলোতেই নয়, উন্নতির পুরোভাগে থাকা দেশগুলোতেও এই সেদিনও এদের দেখা গেছে। তাছাড়া এর একটা ধর্মীয় দিকও আছে। বৃষ্টির জন্য একক ও সম্মিলিত প্রার্থনা প্রায় সব ধর্মের মধ্যেই প্রচলিত রয়েছে।

আর এক ধরনের দাবি বৃষ্টি নামাবার ক্ষেত্রে করা হতো যাদের ভাব-ভঙ্গি ছিলো যে এগুলো বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, কিন্তু আসলে বিজ্ঞানসম্মত কিছুই এতে থাকতো না। এ-ও উন্নত দেশেরই কাহিনী। বজ্রের মতো শব্দ করা, মেঘের দিকে লক্ষ্য করে কামান দাগা, বস্তার পর বস্তা ধূলো ওড়ানো ইত্যাদি কাজ এর জন্য করা হতো আর তার জন্য বিজ্ঞান সদৃশ এক ধরনের ব্যাখ্যাও দেয়া হতো। এরপর যদি কখনো কখনো

বৃষ্টি নামতো তা হলে এই বিশেষজ্ঞদের নাম ছড়িয়ে পড়তো চারিদিকে। এ বৃষ্টি যে এমনিতেও নামতে পারে এবং একই রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বহুবার বৃষ্টি যে নামেনি, সে কথা তখন কেউ খেয়াল রাখতো না। মানুষের হস্তক্ষেপে সত্যি সত্যি বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা হয়েছিলো সর্বপ্রথম ১৯৪৬ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ল্যাংম্যুর আর শেইফারের বিখ্যাত এক পরীক্ষায়। তাঁরা গবেষণাগারে দেখলেন যে ড্রাই আইস বা শুষ্ক বরফ নামে পরিচিত কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ছোটো ছোটো ডেলা অথবা সিলভার আয়োডাইডের সূক্ষ্ম গুড়া অতিশীতল কুয়াশার মধ্যে ছেড়ে দিলে তাতে অধঃক্ষেপণ ঘটে। ড্রাই আইস অতিঠাণ্ডা জিনিস, এর উত্তাপ—৭০° সে.। জলবিন্দুগুলোর মধ্যে গিয়ে এটা বরফ কেলাসের সূত্রপাত ঘটায়। অন্যদিকে সিলভার আয়োডাইডের কেলাস গঠন বরফের অনুরূপ, তাই এটাও বরফ কেলাসের জন্য উপযুক্ত ধূলি-বীজ হিসেবে কাজ করে। উভয় ক্ষেত্রে ফল একই হয়। বের্গেরসনের তত্ত্ব অনুসারে বরফের মধ্যস্থতায় বৃষ্টির ফোঁটা গঠিত হয়। বরফের জন্য কৃত্রিমভাবে ধূলি-বীজের ব্যবস্থা করা হলো বলে একে কৃত্রিম বীজনও বলা হয়।

গবেষণাগারে সাফল্যের পরপরই আকাশে বৃষ্টি সৃষ্টির জন্য কৌশলটিকে ব্যবহার করা হলো। বিমান থেকে ড্রাই আইসের ডেলা ছড়িয়ে দেয়া হলো শীতল মেঘের ভেতর। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাতে বরফ কণার সমাগম হলো এবং বৃষ্টি ঝরে পড়লো। পরিমাণ অবশ্য তেমন কিছু হলো না, তবুও প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সেটি ছিলো অনন্য। সিলভার আয়োডাইড ব্যবহার করেও একই ফল পাওয়া গেলো। এটা বিমান থেকে ছড়ানো হলো মেঘের মধ্যে ধোঁয়ার আকারে। আবার ভূমি থেকে উপরের দিকে ছুঁড়েও দেয়া হলো। দুটোই কার্যকর হলো।

চল্লিশের দশকে এসব প্রাথমিক সাফল্য যথেষ্ট আশাবাদের সৃষ্টি করেছিলো ইচ্ছেমাফিক বৃষ্টি ঘটাবার প্রতিশ্রুতি এনে দিয়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে সে আশাবাদ যেন সংযত হয়ে পড়লো। দেখা গেলো বহু চেষ্টাতেও ঠিক উপকৃত হবার মতো বৃষ্টি ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। সব সময় বোঝাও যায় না যেটুকু বৃষ্টি হলো তাও কৃত্রিম বীজনের কারণে, না কি স্বাভাবিক কারণে। সংখ্যাতাত্ত্বিক নিয়ম প্রয়োগ করে দেখার চেষ্টা হলো কৃত্রিম বীজনের সাথে মোট বৃষ্টিপাতের বা বৃষ্টিপাত বৃদ্ধির কোনো যথার্থ সম্পর্ক রয়েছে কিনা। তাতেও খুব একটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বড় জোর এটুকু বলা যায় যে ইতোমধ্যে অধঃক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে এমন মেঘে কৃত্রিম বীজন বৃষ্টিপাত ত্বরান্বিত করে। কিন্তু যখন যেখানে প্রয়োজন ইচ্ছেমাফিক সেখানে বৃষ্টিপাত ঘটানো, কোনো জায়গার সার্বিক বৃষ্টিপাত বাড়ানো—এসব লক্ষ্য বোধ হয় এখনো বহু দূর রয়ে গেছে।

মনে হচ্ছে বৃষ্টি আরো বহুদিন প্রকৃতির মর্জিমাফিকই আসবে। আমাদেরকে আপাতত সেই মর্জিটা যথাসম্ভব বুঝতে শিখে তার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টাই করতে হবে।

তীব্র তড়িৎ হাসি হেসে
বজ্রভেরীর স্বরে
তোমার ঘরে চমকি
জগৎ যদি এক নিমিষে
শক্তি মূর্তি ধরে
দাঁড়ায় মুখোমুখি

বজ্র-দেবতারা, ফ্রাঙ্কলিন ও তারপর

দৈব দুর্বিপাক

বজ্রের চেহারা আর তর্জন গর্জন এমন যে তার প্রতি ভয়-ভীতি মানুষের চিরন্তন। প্রাচীন মিশরীয়ারা মনে করতো দেবতা টাইফন আকাশ থেকে বজ্র হানে। প্রায় ২৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের একটি সুমেরীয় সীলমোহরে দেখা যায় বিজলীর দেবী জারপেনিভ ও তাঁর স্বামী যুদ্ধে চলেছেন বায়ু রথে চড়ে দুহাতে দু'গুচ্ছ বজ্রবাণ নিয়ে। দেবরাজ ইন্দ্রের অপর নামই হলো বজ্রধর, তাঁর সঙ্গে সহস্রমুখী বজ্রাস্ত্র। গ্রীকদের জিউস এবং রোমানদের জুপিটার দেব-পিতার ভূমিকায় যখনি মর্ত্যের কারো উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন তখনই বজ্র-বিজলীর আঘাত হেনে সে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। জুপিটারের বজ্রাস্ত্র তৈরি হতো দেব কর্মকার ভালকানের নিজস্ব অগ্নিকুণ্ডে। এ-সব কিংবদন্তী থেকে মানুষের মনে বজ্র বিজলীর স্থানটি আঁচ করা যায়।

বজ্র-বিজলীর আঘাতে ক্ষয়ক্ষতি মানুষ চিরকাল অসহায়ভাবে সহ্য করেছে। নানা রকম তুকতাক ব্যবস্থা নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই তার করার ছিলো না। উদাহরণস্বরূপ বহু শতাব্দী ধরে গীর্জার সুউচ্চে রাখা ঘণ্টা সজোরে বাজিয়ে বজ্রের বিপদ কাটাবার একটা রীতি প্রচলিত ছিলো। এতে ঘণ্টাবাদকের জন্য বিপদটা বাড়ানো ছাড়া আর কোনো লাভই যে হয়নি তা বুঝতে বহুদিন

কেটে গেছে। ১৭৮৪ সালে জার্মানীর মিউনিকে প্রকাশিত এক বইয়ের হিসাব অনুসারে সে সময় ৩৩ বছরে সেখানে ৩৮৬টি গীর্জা টাওয়ারের উপর বজ্রাঘাত ঘটেছে এবং তাতে ১০৩ জন ঘণ্টা-বাদকের মৃত্যু ঘটেছে।

বিদ্যুৎ নিয়ে কিছু কথা

মেঘ বৃষ্টি বজ্র এ সব ছেড়ে আমরা খানিকক্ষণ তাকাই বস্তুর একটি পরমাণুর ভেতরে। এখানে রয়েছে ইলেকট্রন আর প্রোটন নামে দু রকমের কণিকা। ইলেকট্রনে থাকে বিদ্যুতের ঋণাত্মক চার্জ আর প্রোটনে ধনাত্মক চার্জ। পরিমাণে এই দুই সমান চার্জের ক্ষুদ্রতম একক এরা। উভয় কণিকা প্রত্যেক পরমাণুতে সমান সংখ্যায় থাকে বলে পরমাণু নিজে সাধারণত বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ—সামগ্রিকভাবে তার কোনো চার্জ নেই। ধনাত্মক প্রোটনগুলো থাকে পরমাণুর কেন্দ্রে ছোট নিউক্লিয়াসের মধ্যে ; তাই এরা সাধারণ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ইলেকট্রন-গুলো পরমাণুর অনেকখানি ফাঁকা জায়গায় ছড়ানো থাকে পরিক্রমণ-শীল অবস্থায়।

বিদ্যুতের নিয়ম হচ্ছে সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে আর বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ছড়ানো ইলেকট্রন-গুলো বিপরীতধর্মী নিউক্লিয়াসের আকর্ষণে পরমাণুতে বাঁধা থাকলেও এদের মধ্যে যেগুলো একটু বাইরের দিকে রয়েছে সেগুলোকে ঘষা-ঘষিতে বা অন্য প্রক্রিয়ায় খসিয়ে ফেলা যায়। এভাবে যে পরমাণুর ইলেকট্রন খসে গিয়ে ঋণাত্মক চার্জ কমলো সেটি বিদ্যুৎ নিরপেক্ষতা হারিয়ে হয়ে পড়ে ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট। আবার ঐ খসা ইলেকট্রন-গুলো যদি অন্য কোনো পরমাণু গ্রহণ করে তাহলে সেটা হয়ে পড়ে ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট। এভাবে ঋণাত্মক বা ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট

হওয়াটাকে বলা হয় পরমাণুর আয়নয়ন, আর সে রকম পরমাণুকে বলা হয় আয়ন।

কাচ বা যুৎসই অন্য কোনো বস্তুকে চামড়া বা এরকম কিছু জিনিস দিয়ে ঘষে তার কিছু পরমাণুকে আয়নিত করা যায়। বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে এভাবে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক উভয় রকম চার্জপূর্ণ বস্তু সৃষ্টি করা যায়। বিপরীতধর্মী চার্জ রয়েছে এ রকম দুটো বস্তু পরস্পরের কাছে এলে উভয়ের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ চাপের সৃষ্টি হয় যা ভোল্টের এককে মাপা হয়। এই চাপের প্রবণতা থাকে ইলেকট্রনকে ঋণাত্মক চার্জের বস্তু থেকে ধনাত্মক চার্জের বস্তুর দিকে প্রবাহিত করা, মাঝখানের বাতাস সাধারণত বিদ্যুৎ অপরিবাহী বলে তা এরকম প্রবাহে বাধ সাধে। কিন্তু চাপটা যদি যথেষ্ট প্রবল হয় তাহলে বাতাসের বাধা আর টেকেনা। ইলেকট্রন এক বস্তু থেকে অন্যটিতে ঝাঁপ দেয় এবং পথের মধ্যে বাতাসের অণুর সাথে ঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করে।

ধরা যাক ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট একটি বস্তুর কাছে অন্য একটি বস্তু আনা হলো যা বিদ্যুৎ পরিবাহী (যে কোনো ধাতু এ রকম পরিবাহী), দ্বিতীয় বস্তুটিতে যদি কোনো চার্জ শুরুতে নাও থাকে এ অবস্থায় রাখলে তার মধ্যে কিছু চার্জ দেখা দেবে। এর কারণ পরিবাহী বস্তুতে প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন থাকে যারা কাছের বস্তুর চার্জের প্রভাবে নিজেদেরকে পুনর্বিন্যস্ত করে। উদাহরণস্বরূপ ঐ বস্তুটি যদি ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট হয় তা হলে পরিবাহী বস্তুটির যে অংশ তার বেশি কাছে সেখানে ইলেকট্রন এসে জমা হয়ে তাকে ঋণাত্মক চার্জপূর্ণ করে তুলবে। আবার যে অংশ দূরবর্তী তাতে ইলেকট্রনের ঘাটতির কারণে ধনাত্মক চার্জের সৃষ্টি হবে। এভাবে দূরবর্তী চার্জের প্রভাবে অন্য বস্তুতে চার্জ প্রদর্শিত হবার ঘটনাকে বলা হয় বৈদ্যুতিক আবেশন।

সে অবস্থায় ঐ পরিবাহী বস্তুটি চার্জে আবেশিত হয়েছে এমন বলা হবে। এরকম আবেশিত বস্তুর কারণেও স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হতে পারে।

বিদ্যুতের সাথে বিজলির সাদৃশ্য

এবার আমরা আবার ইতিহাসে ফিরে যাই। ১৬০০ সালে রানী এলিজাবেথের চিকিৎসক উইলিয়াম গিলবার্ট কাচের গোলককে ঘষে তার মধ্যে চার্জ সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর দেড়শ বছর ধরে নানা রকম বৈদ্যুতিক মেশিনের উদ্ভাবন হয়েছে যেখানে কাচ বা গন্ধকের গোলক বা বর্তুল সজোরে ঘুরিয়ে ও ঘর্ষণ করে তাকে চার্জ দেয়া হতো। তখন এর কাছে ধাতু বা অন্য পরিবাহী আনলে কয়েক ইঞ্চি লম্বা স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যেতো আর শোনা যেতো ক্যাড়-ক্যাড় আওয়াজ।

এমনি একটি বিদ্যুৎ মেশিন কিনেছিলেন আমেরিকার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। এ নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিলো না। ফ্রাঙ্কলিনের আগে অনেকে লক্ষ্য করেছিলেন বিদ্যুৎ মেশিনের স্ফুলিঙ্গের সাথে আকাশের বিজলীর সাদৃশ্য। স্বয়ং নিউটন লিখেছিলেন 'এরা আমাকে ছোট, অতি ছোট পরিমাপে আকাশের বিজলীর কথা মনে করিয়ে দেয়।' ফ্রাঙ্কলিন এই সাদৃশ্যের ১২টি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর নবম সাদৃশ্যটি ছিলো 'প্রাণীকে ধ্বংস করা'। এ ব্যাপারে ফ্রাঙ্কলিন নিশ্চিত ছিলেন কারণ কিছুদিন আগেই তিনি বনভোজনের টার্কী-মুরগিকে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের শক দিয়ে মেরে সবাইকে তাক লাগিয়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি নিজেও একবার এক পরীক্ষায় শক খেয়ে মরতে বসেছিলেন।

একটি ঘুড়ি, একটি মৃত্যু ও আরো কিছু কাহিনী

বিদ্যুতের সাথে বিজলির সাদৃশ্যের আলোচনায় ফ্রাঙ্কলিন একবার লিখেছিলেন 'বৈদ্যুতিক তরল (সে সময় বিদ্যুতকে এক রকম অদৃশ্য তরল বলে কল্পনা করা হতো) সূচালো বস্তুতে আকর্ষিত হয়। আকাশের বিজলিরও এই একই গুণ আছে কিনা আমরা জানিনা। কিন্তু যতোদিক থেকে উভয়ের তুলনা ইতোমধ্যে সম্ভব হয়েছে তার সবকটিতেই এরা সদৃশ বলে দেখা গেছে। তাই এই বিষয়টিতেও এরা যে এক হবে সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? এ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

যেই বলা সেই কাজ। এই 'পরীক্ষাই' সেই বিখ্যাত ঝড়ের আকাশে ঘুড়ির পরীক্ষা—যা ফ্রাঙ্কলিনকে বিজ্ঞানের ইতিহাসেও স্মরণীয় করে রেখেছে। হাল্কা কাঠের কাঠামোতে সিল্ক কাপড়ের তৈরি এ ঘুড়ি ফ্রাঙ্কলিন উড়িয়েছিলেন ১৭৫২ সালের গ্রীষ্মের এক বিকেলে নিজের ছেলের সহায়তা নিয়ে। ঘুড়ির সাথে ছিল ফুটখানেক লম্বা একটি লোহার শিক যার সূঁচালো অগ্রভাগ ঘুড়ির মাথা থেকে বের হয়ে ছিলো। কয়েক বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিলো লাইডেন জার। এটা ভেতর-বার ধাতুর পাতে মোড়া একটা কাচের বোতল। ভেতরের পাতে ঋণাত্মক বিদ্যুতের চার্জ দিলে তা ধনাত্মক চার্জ আবেশিত করে বাইরের পাতে। এভাবে লাইডেন জারের মধ্যে বেশ খানিকটা চার্জ সঞ্চয় করে রাখা যায়। ফ্রাঙ্কলিনের ঘুড়ি যখন উড়ছিলো তখন তার সূতার অন্য প্রান্ত একটা সিল্কের ফিতার মাধ্যমে হাতে ধরা ছিলো মাঠের কিনারার একটি কুটিরে। আর সেখানে রাখা ছিলো একটি লাইডেন জার।

বাইরে বৃষ্টি আর বিজলির চমক এক সাথে চলছিলো। বৃষ্টিতে ভিজে সূতা হয়ে উঠেছে বেশ বিদ্যুৎ পরিবাহী। উৎফুল্ল ফ্রাঙ্কলিন লক্ষ্য

করলেন সুতার গোড়ায় এলোমেলো কিছু ক্ষুদ্র আঁশ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে গায়ের লোম খাড়া হবার মতো। তিনি জানতেন বিদ্যুতায়িত হলে সমপ্রকৃতির চার্জের পরস্পর বিকর্ষণের কারণে আঁশগুলো এ রকম হতে পারে। ভেজা সুতার গোড়ায় বাঁধা একটা চাবির কাছে তিনি তাঁর তর্জনীটা আনতেই দেখা গেলো চাবি থেকে আঙুলের দিকে একটি স্ফুলিঙ্গ ঝাঁপ দিলো ক্যাড়ক্যাড় শব্দ তুলে—ঠিক যেমনটি বিদ্যুৎ মেশিনে হয়।

এবার লাইডেন জারটির মধ্যে সুতা-বেয়ে-আসা বিদ্যুৎ চার্জ যথেষ্ট সঞ্চিত করলেন ফ্রাঙ্কলিন। আরেকটি লাইডেন জারে সঞ্চিত হলো বিদ্যুৎ মেশিন থেকে চার্জ। উভয়ের তুলনা করলেন তিনি বিদ্যুৎ-বীক্ষণ যন্ত্রে, সেভাবে বিজলির থেকে পাওয়া চার্জের প্রকৃতিও নির্ণয় করলেন তিনি। দেখা গেলো সাধারণ ঋণাত্মক চার্জের মতোই এর সব আচরণ।

ফ্রাঙ্কলিনের ঘুড়ির পরীক্ষার কথা আজ সবাই জানলেও আর একজনের কথা কেউ বিশেষ মনে রাখেনি। এরও মাস খানেক আগে ফ্রাঙ্কলিনের মূল পরিকল্পনা অনুসারে একই ধরনের আর একটি পরীক্ষা চালান প্যারিসে ফ্রাঁসোয়া দ্য আলিবার্ড। গীর্জার চূড়া থেকে তুলে দেওয়া ৪০ ফুট লম্বা সূঁচাগ্র লোহার রডের মাধ্যমে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন বজ্র বিদ্যুৎ। কিছুদিন পর ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী পীয়ের ল্যামোনীয়ের একইভাবে দেখালেন যে বিদ্যুৎ সংগ্রহের জন্য বজ্র-সঙ্কুল আবহাওয়ারও খুব প্রয়োজন নেই। বেশ পরিষ্কার দিনেও ও রকম সূঁচাগ্র রড থেকে কিছু বিদ্যুৎ সংগৃহীত হয়। মেঘলা দিন হলে এটা বেশি হয়। আকাশে বিজলি চমকালে তখন আরো বেশি।

এ সময় ঘটলো একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সেণ্ট পীটার্সবার্গে (বর্তমান লেনিনগ্রাদ) এই একই পরীক্ষা চালাতে গিয়ে বৈদ্যুতিক শকে

নিহত হলেন প্রফেসর রিখম্যান। তিনি সমস্ত সাবধানতা নিয়েছিলেন, দণ্ড সংলগ্ন ধাতুর তার হাতে ধরেছিলেন মোমের অন্তরকের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এবার বিদ্যুৎ প্রবাহ এতো শক্তিশালী ছিলো যে তা মোমের বাধা মানে নি।

ল্যামোনীয়েরের পরিষ্কার আকাশের বিদ্যুৎ সংগ্রহ আর রিখম্যানের দুর্ঘটনাকে এক সাথে মিলিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে খুব বিরল ক্ষেত্রেই লোহার দণ্ডে বিজলি সরাসরি এসে পড়ে। ফ্রাঙ্ক-লিন বা দ্য আলিবার্ড এঁরা কেউই বিদ্যুৎ সরাসরি বিজলি থেকে পাননি, পেয়েছেন কাছের বাতাস থেকে যা বজ্র মেঘের দ্বারা আবেশিত হয়েছে। সূঁচাগ্র রড বা ঘুড়ির আগার শিক যখন বজ্র মেঘের তলায় এসেছে তখন মেঘের তলদেশের চার্জের পরোক্ষ আবেশনে লোহার আগায় বিপরীত চার্জের সমাবেশ ঘটেছে। এভাবে সূঁচাগ্র লোহায় বৈদ্যুতিক চাপ যথেষ্ট হলে সেখান থেকে কিছু চার্জ নিকটবর্তী বাতাসের অণুকে আয়নিত করে তাদের মাধ্যমে মেঘের দিকে অগ্রসর হয়েছে। আবেশিত বিপরীত চার্জ এভাবে কিছু চলে গেলে মেঘের তলদেশের সমপ্রকৃতির চার্জের আধিক্য ঘটে লৌহদণ্ডের ভেতর এবং তার থেকে ভেজা সূতায় এবং লাইডেন জারে। বজ্র মেঘের তলদেশে সাধারণত ঋণাত্মক চার্জ থাকায় লাইডেন জারে সংগৃহীত চার্জও ঋণাত্মক হয়। অধিকাংশ পরীক্ষক এই অর্থেই বজ্রের বিদ্যুৎ সংগ্রহ করেছেন, ফ্রাঙ্কলিন-সহ। রিখম্যানই ছিলেন ব্যতিক্রম। সরাসরি বজ্রপাতে বিজলির বিদ্যুৎ নামিয়ে এনে তিনিই বোধ হয় চূড়ান্ত এবং মর্মান্তিক প্রমাণ দিয়ে গেছেন যে আকাশের বিজলি সাধারণ বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই নয়।

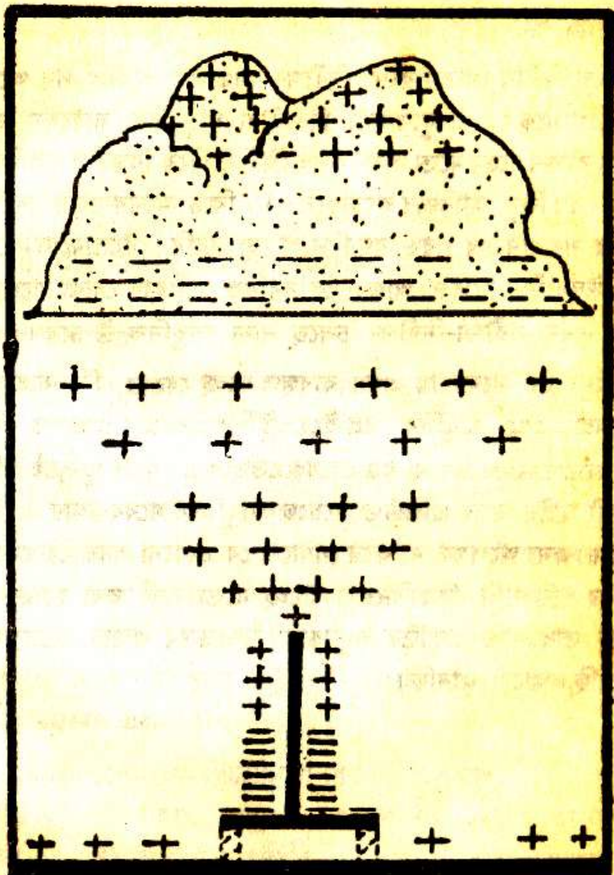

ফ্রাঙ্কলিন যেভাবে বিজলির বিদ্যুৎ সংগ্রহ করেছিলেন। বজ্রমেঘের তলার ঋণাত্মক চার্জের আবেশনে ধাতু-দণ্ডের অগ্রভাগে ধনাত্মক চার্জের সমাবেশ হয়। এরা বিদ্যুৎ চাপের ফলে বাতাসে হারিয়ে যেতে থাকলে ধাতু-দণ্ডে ঋণাত্মক চার্জের আধিক্য দেখা দেয় এবং তা সংগৃহীত হতে পারে।

দিশারীদের পর

বিজলির বিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফ্রাঙ্কলিন প্রমুখের পর অনেক দূর এগিয়েছে। ঐ দুঃসাহসী দিশারীরা ঘুড়ি, রড, লাইডেন জার, বিদ্যুৎ-বীক্ষণ যন্ত্রের মতো সাধারণ সব জিনিস দিয়ে বিজলির মূল বৈশিষ্ট্যের বেশ কিছু আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু অনেকগুলো মৌলিক প্রশ্নের সমাধান এর পরও বহু দিন পাওয়া যায়নি। ইতোমধ্যে অনেক কিছু উদ্‌ঘাটিত হলেও, আজও যে সবকিছু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তা নয়। এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে নানা আধুনিক উপায়ে।

বজ্র-বিদ্যুতের গবেষণায় এখন ব্যবহৃত হচ্ছে রেডার, বিশেষ ধরনের ক্যামেরা এবং আধুনিক বহু ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম। এদের দিয়ে সুসজ্জিত বিমানে উড়ছে বজ্র মেঘের ভেতরে। আবার ভূ-পৃষ্ঠে কৃত্রিম বিজলী সৃষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক গবেষণাগার। বজ্রপাতের জন্য অপেক্ষা না করে সেখানে যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের শক্তিশালী বিজলি-রেখা ইচ্ছে মতো সৃষ্টি করা হচ্ছে—আর চলছে তার গতি প্রকৃতির অনুসন্ধান। এভাবে আমরা অনেকখানি জেনেছি, আরো জানছি।

আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই
কিসের বাতাস লেগেছে
জগৎ-ঘূর্ণি জেগেছে

একটি বজ্রমেঘের জীবনকাহিনী

সৃষ্টি অস্থিতি আর বিলয়

উষ্ণ আর্দ্র দিন। বেশ কিছু সাদা প্যাঁজা তুলার মতো মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। তেমন উঁচুতেও মনে হচ্ছে না এদের। হঠাৎ এদের একটার উপরের অংশে কেমন যেন একটা তোলপাড় লক্ষ্য করা গেলো। মেঘটা যেন ফুলে ফেঁপে ক্রমশ আরো প্রশস্ত, আরো উঁচু হয়ে চললো। আর এর তলার দিকটাতেও ঘটলো বেশ কিছু পরিবর্তন। মনে হলো তলা থেকে যেন একটা কুঁচকানো কালো কাঁথা কেউ মাটির উপর পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়েছে। একটু পরেই দেখা গেলো বিজলির চমক আর শোনা গেলো গুড়গুড় ডাক। বোঝা গেলো বজ্রমেঘ এবার জমে উঠেছে।

প্রথম যে মেঘগুলো দেখা গিয়েছিলো সেগুলো স্তূপ মেঘ, উচ্চতা হাজার বিশেক ফুট পর্যন্ত হতে পারে। এরপর যে মেঘটা তোলপাড়ে বিশাল হয়ে উঠলো সেটি স্তূপ বাদল (কিউম্যুলো নিম্বাস) বা বজ্রমেঘ। এই পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে কতগুলো কারণ ও ঘটনা। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যা তা হলো জোরালো উর্ধ্বগামী বাতাস। গ্রীষ্মের গরম ও আর্দ্র দিনে এমনি হওয়া স্বাভাবিক। উপরে উঠে শীতল হয়ে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয় বটে কিন্তু তা হয় অস্থিতিশীল। ঘনীভবনের সুপ্ততাপ বাতাসকে আবার উত্তপ্ত করে, এর উর্ধ্বে উঠাও

তাই অব্যাহত থাকে। এর স্থান নিতে নীচ থেকে আরো বাতাস এই উর্ধ্ব প্রবাহে যোগ দেয়। এরা মেঘকে উপরের দিকে ফাঁপিয়ে তোলে রীতিমতো এক তোলপাড় তুলে। উঁচু হয়ে ফেঁপে ওঠা মেঘ নিজেই যেন বাতাসের জন্য একটি চিমনীর মতো হয়ে ওঠে। ভূমির গরম বাতাস সব দিক থেকে এসে যেনো এই মেঘের চিমনীর মধ্য দিয়ে উপরে উঠতে চায়। ফলে মেঘ আরো উঁচু হয়। বাতাসের জোরালো এই উর্ধ্বগামিতাই বজ্রমেঘ সৃষ্টির পেছনে মূল কারণ।

পুরো গঠিত একটি বজ্রমেঘের **উপরিভাগ** ৭ মাইল পর্যন্ত উপরে উঠে যেতে পারে এবং সেখানে এর উষ্ণতা নেমে আসে—৩৯^{0} সে এর মতো অতি নিম্নে। এখানকার অতি শীতল জলবিন্দু শিগ্‌গির ক্ষুদ্র বরফ কেলাস, নরম শিলা অথবা তুষার কণার রূপ নিয়ে অধঃক্ষিপ্ত হতে আরম্ভ করে। এদিকে বজ্রের বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াগুলোও শুরু হয়ে যায় এবং বিজলি ও মেঘ গর্জনের সূচনা হয়। বজ্রমেঘের উপরিভাগ অনেক শীতল হলেও এর তলদেশে উত্তাপ 0^{o} সে. এরও কিছু উপরে থাকে। এখানে অপেক্ষাকৃত বড় জলবিন্দু ঘন হয়ে থাকে। তাদের মাঝে আলো শোষিত হয় বলে এ মেঘের তলদেশকে এমন কালো দেখায়।

অধঃক্ষেপণ এ সময় বজ্রমেঘের তলায় কোনো কোনো এলাকায় স্থানীয়ভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। কখনো কখনো ঘটে শিলাবৃষ্টি। বৃষ্টি যে রকম অঝোরধারায় নামে তাতে অল্প সময়ে এক বর্গমাইলের মতো এলাকায় দেড় ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। এ রকম পানির ওজন এক লক্ষ টনেরও বেশি। ততোখানি পানিকে বজ্রমেঘে উপরে ধরে রাখতে বাতাসের য কি পরিমাণ জোরালো উর্ধ্বপ্রবাহ দরকার তা বিস্ময়কর। এ প্রবাহ ঘণ্টায় ৭০ মাইল পর্যন্ত বেগে পৌঁছুতে পারে। বৃষ্টির ফোঁটা যথেষ্ট বড় আর ভারী না হলে এই প্রবাহ অগ্রাহ্য করে নামতে পারে না। তাই বজ্র বৃষ্টির ফোঁটা এতো বড়, ধারা এত প্রবল।

মুষল ধারায় বৃষ্টির ঝাপটে স্থানীয়ভাবে বাতাসে আর একটি নিম্নাভিমুখী প্রবাহের সৃষ্টি হয়। উপর থেকে আসা বাতাস ঠাণ্ডা, আর তার জলীয়বাষ্প ইতোমধ্যে বেরিয়ে গেছে বলে তা শুষ্কও বটে। এতোক্ষণ যেখানে গরম গুমোট আবহাওয়া বিরাজ করছিলো, এই নিম্নগামী বায়ু

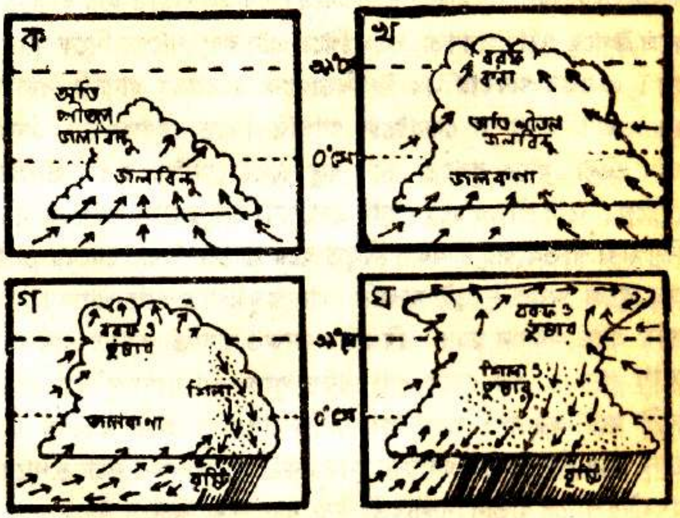

বজ্রমেঘের চার পর্যায় :

(ক) শুধু জলবিন্দুতে গড়া স্তুপ মেঘ।

(খ) জোরালো ঊর্ধ্বগামী বাতাসে ফেঁপে ওঠা মেঘ। উপরটা খুব শীতল সেখানে বরফকণা।

(গ) চিত্রে সাদা অংশে জলকণা ও বরফ শিলা ঊর্ধ্বগামী বাতাসে ভাসমান; এখানেই বিদ্যুৎ চার্জের সৃষ্টি ও বিন্যাস ঘটছে। চিত্রে ধূসর অংশে ভারী বৃষ্টিপাতের সাথে নিম্নগামী ঠাণ্ডা বাতাস।

(ঘ) অন্তিম দশা। উপরের অংশ নেয়াইয়ের (এনভিল) আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। বৃষ্টিপাতের এলাকা প্রসারিত (ধূসর), বিদ্যুৎ সৃষ্টির এলাকা (সাদা) ক্রমবিলুপ্ত।

প্রবাহ সেখানে হঠাৎ করে আরামপ্রদ শীতলতা নামিয়ে আনে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য। এদিক থেকে বজ্রবৃষ্টি একটি বিশাল শীতাতপ নিয়ন্ত্রকের মতো কাজ করে।

বজ্রমেঘ উঁচু হতে হতে শেষ পর্যন্ত যখন এর উপরিভাগ ১০ মাইলের মতো উচ্চতায় পৌঁছে তখন উচ্চতার সাথে এর উত্তাপ আর কমে না। ফলে উপরে ওঠার প্রবণতা কমে গিয়ে এটা বরং পাশের দিকে বিস্তৃত হয়। এ-রকম অবস্থায় এর উপরিভাগকে কামারের হাতুড়ি পেটাবার ধারক এনভিলের বা নেয়াইয়ের আকৃতি নিতে দেখা যায়। এমনটি যখন দেখা যাবে বুঝতে হবে বজ্রমেঘের অন্তিম দশা উপস্থিত হয়েছে। ভূমি শীতল হয়ে পড়ায় উর্ধ্বগামী বায়ুর উৎস বন্ধ হয়ে যায়। নিম্নগামী শীতল বায়ুর অঞ্চল বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এবার মেঘের তলায় প্রায় পুরো অঞ্চল জুড়েই মাঝারি গোছের বৃষ্টিপাত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এরও অবসান হয়। বিজলির চমকও কমতে কমতে একেবারে লোপ পায়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা দু'এক ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয় না। তবে কোনো কোনো সময় একটা বজ্রমেঘ শেষ হবার সময় নিকটবর্তী এলাকায় আর একটি শুরুর কারণ ঘটাতে পারে। প্রথমটির শীতল বাতাস নিকটবর্তী উষ্ণ বাতাসকে আটকে দিয়ে তাকে খাড়া উপরে উঠতে বাধ্য করে।

প্রকাণ্ড এক বিদ্যুৎ মেশিন

বিদ্যুৎ মেশিনের সাথে ইতোমধ্যেই আমরা পরিচিত হয়েছি। সেখানে ঘর্ষণের ফলে কোনো বস্তুর মধ্যে গড়ে তোলা হয় বৈদ্যুতিক চার্জ। বিপরীত চার্জের অন্য বস্তু অথবা পরিবাহী কোনো বস্তুকে কাছে আনলে দু'য়ের মধ্যে বিদ্যুৎ চাপের ফলে দেখা দেয় স্ফুলিঙ্গ। আকাশের বজ্রমেঘও একটি প্রকাণ্ড বিদ্যুৎ মেশিন যেখানে সৃষ্টি হয় লক্ষ লক্ষ

ভোল্টের বিদ্যুৎ চাপ আর বহু মাইল দীর্ঘ স্ফুলিঙ্গ। অবাক হবার বিষয় হলো বায়ুতাড়িত অসংখ্য জলকণা আর বরফকণায় গড়া এই বজ্রমেঘ কেমন করে পরিণত হয় এমনি প্রকাণ্ড বিদ্যুৎ মেশিনে।

১৭৫৫ সালে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন লিখেছিলেন 'আমি এখনো কিছুতেই বুঝছি না কেমন করে এরা বিদ্যুতের চার্জ পায়। এ সম্পর্কে যতো অনুমান খাড়া করি কোনটাই আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।' আজ এতো বছর আর এতো গবেষণার পরও আধুনিক বিজ্ঞানীও প্রায় হুবহু একই কথা বলবেন। যদিও বজ্রমেঘে বিদ্যুতের সৃষ্টি সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রমাণিত তত্ত্ব রয়েছে তাদের কোন্‌টি যে প্রধান এবং অধিক নির্ভরযোগ্য সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে সব ক'টা তত্ত্বের মূলকথাটি মোটামুটি এক। বজ্রমেঘের মধ্য দিয়ে বয়ে যায় যে জোরালো ঊর্ধ্বগামী বায়ু তার তোলপাড়ে জলকণা, বরফকণা, শিলাখণ্ড আর ধূলিকণার পারস্পরিক যে ঘর্ষণ বিদ্যুৎ সৃষ্টির কারণ সেখানেই নিহিত। এসব কণার প্রত্যেকটিতে খুব অল্পই চার্জ তৈরি হয়। কিন্তু যেহেতু এদের সংখ্যাটি বিশাল তাই মোট ফল গিয়ে দাঁড়ায় অত্যন্ত বড় একটা পরিমাণে, এ জন্যই তো বজ্রমেঘ এতো প্রকাণ্ড একটি বিদ্যুৎ মেশিন।

পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে বজ্রমেঘের একেবারে উপরিভাগে থাকে ধনাত্মক চার্জ। এর দু'এক মাইল নীচ থেকে একেবারে তলদেশ পর্যন্ত এলাকায় থাকে ঋণাত্মক চার্জ। আবার এও দেখা গেছে যে উপরিভাগে সূক্ষ্ম বরফকণা ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু নীচের অংশে রয়েছে অপেক্ষাকৃত ভারী নানা কিছু—বড় বরফকণা, পানির ফোটা এবং শিলাখণ্ড। তাই এটা স্পষ্ট যে ধনাত্মক চার্জ আশ্রয় করে আছে সূক্ষ্ম হালকা কণাকে আর ঋণাত্মক চার্জ ভারী কণাকে। সে ক্ষেত্রে নিছক মাধ্যাকর্ষণের তারতম্যেই মেঘের ভেতর উভয় প্রকারের চার্জ আলাদা

হয়ে পড়তে পারে। অবশ্য উর্ধ্বগামী বাতাসেরও একটা ভূমিকা আছে এখানে। সেটা অনেকটা শস্যকে কুলা-ঝাড়া করার মতো। কুলায় ঝাড়লে হালকা তুষ যে রকম বাতাসে উড়ে উপরে যায় আর ভারী শস্য নীচে পড়ে যায়—এখানেও তেমনি বাতাসের কারণে ধনাত্মক চার্জ নিয়ে সূক্ষ্ম কণা উপরে চলে যায়, আর ঋণাত্মক চার্জ নিয়ে ভারী কণা যায় নীচে।

চার্জ সৃষ্টির নানা প্রক্রিয়া

বজ্রমেঘের কোলে বিদ্যুৎ চার্জের জন্ম এখনো কিছুটা রহস্যাবৃত। তবুও বেশ কিছু সম্ভাব্য কারণ এখন উদ্ঘাটিত হয়েছে। চার্জ সৃষ্টিতে কমবেশি এদের সবকটির ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়। প্রক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ :

১. পানির অণু একটি পোলারিত অণু অর্থাৎ এর এক অংশে ধনাত্মক ও অন্য অংশে ঋণাত্মক চার্জ থাকে—যদিও সামগ্রিকভাবে পুরো অণুটি বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। সাধারণত জলকণায় এবং পানির আবরণে ঢাকা ভেজা বরফকণায় পানির অণুর ধনাত্মক অংশটি বাইরের দিকে মুখ করে থাকে। এ সব কণার পৃষ্ঠদেশটি এভাবে ধনাত্মক হয় বলে সেখানে বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ঋণাত্মক আয়নগুলো আকৃষ্ট হয়। এভাবে এই অপেক্ষাকৃত ভারী কণাগুলো সামগ্রিকভাবে ঋণাত্মক চার্জ লাভ করে এবং মেঘের নীচের দিকে অবস্থান নেয়। অপরপক্ষে বাতাসের বাদবাকি আয়ন—যার অধিকাংশ এখন ধনাত্মক উর্ধ্বগামী বাতাসে উপরে চলে যায়।

২. উপরে ধনাত্মক ও নীচে ঋণাত্মক চার্জ ইতোমধ্যে কিছু জমে উঠলে তাদের আবেশনে মাঝখানের বরফ কণা বা জলকণার উপরে অর্ধেকে ঋণাত্মক চার্জ আর নীচের অর্ধেকে ধনাত্মক চার্জের সন্নিবেশ

ঘটবে। ঊর্ধ্বগামী বায়ুর মুখোমুখি হবে নীচের অর্ধেকের ধনাত্মক চার্জ। তাই বায়ুর মধ্যকার ঋণাত্মক আয়নগুলো এখানে আকৃষ্ট হয়ে কণাগুলোকে সামগ্রিকভাবে ঋণাত্মক করে তুলবে। বাতাসের ধনাত্মক আয়নগুলো মুক্ত থেকে ওপরে চলে যাবে।

৩. বজ্র মেঘের মধ্যে যে তুষার কণা জমে ওঠে তা অনেকটা পালক সদৃশ। পাখির পালকের মতো এর একটি মূল অংশ থেকে সূক্ষ্ম কিছু রশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এদের পরস্পরের সংঘাতে রশ্মিগুলো সহজে ভেঙে গুড়িয়ে যায়। বাইরের দিকে বলে এই রশ্মিতে পানির অণুর ধনাত্মক অংশটুকুর প্রাধান্য থাকে। এ সব ধনাত্মক চার্জ চূর্ণ বরফের গুড়ার সাথে বাতাসে উড়ে উপরে চলে যায়। মূল ভারী তুষার কণা ঋণাত্মক চার্জের আধিক্য নিয়ে নীচে নেমে আসে।

৪ অতি শীতল জল কণা বরফে পরিণত হবার সময় বাইরে একটি বরফের আবরণ সৃষ্টি হয় যার উত্তাপ ০° সে. এর যথেষ্ট নীচে থাকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ভাগ তখনো অনেকটা তরল থাকে এবং উত্তাপও ০° সে. এর কাছে থেকে যায়। উত্তাপের তারতম্যের কারণে পানির অণুর ধনাত্মক অংশটি বাইরের দিকে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে কেন্দ্রীয় ভাগের পানিও জমাট বেঁধে যায়। জমাট বেঁধে এটা প্রসারিত হয় বলে তার চাপে বাইরের আগের বরফ গুড়িয়ে যায় এবং গুড়ো গুলো ধনাত্মক চার্জ নিয়ে উপরে উঠে যেতে পারে।

উল্লিখিত সবকটি প্রক্রিয়ার বাস্তবভিত্তি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। তবে কোন্‌টি যে প্রধান প্রক্রিয়া তা এখনো স্পষ্ট হয়নি। যে ভাবেই হোক প্রকাণ্ড এই বিদ্যুৎ মেশিনে চার্জ সৃষ্টি আর চার্জের বিন্যাসটি সম্পন্ন হলে তার ফলশ্রুতিগুলো যে খুবই জবর প্রকৃতির হবে তাতে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে

বিজলি রেখার রূপ-রেখা

আমাদের কাছে বজ্রের যত বাহাদুরি তা তার চমকানিতে আর গরজানোতে। এর অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ স্থির বিদ্যুৎ মেশিনের স্ফুলিঙ্গ মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে দেখেছে বহুকাল যাবত। সেখানে আলোর ফুলকি, ক্যাড় ক্যাড় আওয়াজ সবই আছে। কিন্তু তবুও আকাশের বিশাল বিদ্যুৎ মেশিনটি থেকে যা আসে তার জটিলতা তুলনাহীন। গত কয়েক দশকেই শুধু একে আমরা বুঝতে শুরু করেছি।

চমকিত মেঘ ঃ পর্দা বিজলি

মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের সাধারণ ছবিটি হলো উপরে ধনাত্মক অংশ নীচে অনেক খানি জায়গা জুড়ে ঋণাত্মক অংশ। অনেক সময় এই উভয় অংশের মধ্যে বিদ্যুৎ চাপ এত অধিক হয় যে ইলেকট্রন বিজলির আকারে ধাবিত হয় ঋণাত্মক অংশ থেকে ধনাত্মক অংশের দিকে। যথারীতি সেখানে বিজলির চমকেরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু মেঘের জল-বিন্দু, জল-কণা ইত্যাদির আড়ালে এ বিজলির পথ রেখা আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর হয় না। যেটুকু আমরা দেখি তা হলো মেঘের কিনারায় কিছু অংশের আলোকিত হওয়া। তাতে মনে হয় মেঘের অভ্যন্তরটাই যেন ছিটানো এক আলোকে বার বার চমকে উঠছে।

এ ধরনের বিজলিকে পর্দা বিজলিও বলা হয়। রাতের অাঁধারে এ রকম বহু দূরের চমকিত মেঘ আমাদের নিত্য দৃশ্য।

মেঘে আর ভূমিতে বজ্রপাত

মনে করা হয় মেঘ থেকে বিজলি নেমে আসে পৃথিবীতে, তাই আমরা বলি বজ্রপাত। কিন্তু পরে দেখবো বিজলিটা শুধু ভূমিতে নেমেই আসেনা, ভূমি থেকে মেঘের দিকেও যেতে পারে। বজ্র মেঘের তলার দিকটায় বেশ ঘন হয়ে থাকে ঋণাত্মক বিদ্যুতের চার্জ। এর শক্তিশালী আবেশনের প্রভাবে মেঘের নীচের ভূমিতে সৃষ্টি হয় ধনাত্মক বিদ্যুতের সমাবেশ। পরস্পর মুখোমুখি শক্তিশালী বিপরীত ধর্মী চার্জের মধ্যে যে প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-চাপ তারই ফলে ঘটে বজ্রপাত। এভাবে এখানে কয়েক কোটি ভোল্ট চাপ সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। আর যে বিজলির জন্য এই চাপের ফলে তাও আকারে, বহরে তর্জনে গর্জনে সেই কোটি ভোল্টেরই উপযুক্ত বটে।

বিজলির প্রবাহ মূলত ঋণাত্মক ইলেকট্রনের স্থানান্তরের ফলে উদ্ভূত হলেও এর শুরুর প্রক্রিয়াটি দুই বিপরীত চার্জ সমাবেশের যে কোনো-টিতে ঘটতে পারে। সাধারণত যে প্রান্তে বিদ্যুৎ চার্জের ঘনত্ব অধিক বিজলির জন্য সে প্রান্ত থেকেই হয়। বজ্র মেঘের তলার ঋণাত্মক চার্জটুকু হাজার খানেক ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অপরপক্ষে আবেশিত ধনাত্মক চার্জ ভূমিতে ছড়ানো থাকে অনেক বড় জায়গা জুড়ে। কাজেই চার্জের ঘনত্বের কারণে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের জোরটুকু মেঘের প্রান্তেই বেশি থাকে। সাধারণত তাই বিজলির শুরুটা মেঘের দিক থেকেই হয়। তবে ভূমি সংলগ্ন কোনো সূচাগ্র পরিবাহী বস্তু যদি অনেক উঁচু হয়ে খাড়া থাকে তার আগায় যথেষ্ট বিদ্যুৎ ঘনত্ব সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে কখনো কখনো ওখান থেকেই বিজলি

শুরু হয়ে মেঘের দিকে যেতে পারে। মেঘ আর ভূমির মাঝখানে বিজলির এই যে চলাচল তার পথের দৈর্ঘ্য ৫০০ ফুট থেকে দু' মাইল পর্যন্ত হতে পারে।

অগ্রযাত্রার খুঁটিনাটি : বয়েজ ক্যামেরা

আমরা চোখের পলকে বিজলিকে যেভাবে দেখি তার মধ্যে অনেক খুঁটিনাটি হারিয়ে যায়। এর অগ্রযাত্রার প্রতিটি ধাপ যদি পরীক্ষিত হতে না পারে তাহলে বিজলির প্রকৃতি অনেকখানিই অজানা থাকতে বাধ্য। কিন্তু প্রায়শই পুরো ব্যাপারটি সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এত দ্রুত একে অনু-সরণ করবে কার দৃষ্টি? ১৯০২ সালে স্যার চার্লস বয় উদ্ভাবন করেছিলেন এক নতুন ধরনের ক্যামেরা যা বয়েজ ক্যামেরা নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। এর কৌশলটা রয়েছে ফিল্মের সামনে ক্যামেরার লেন্সকে দ্রুত নড়াচড়ার মধ্যে। এভাবে নড়ার ফলে বিজলির ছবির প্রথম অংশ ফিল্মের যেখানে ওঠে, পরের অংশটি একটু সরে ওঠে তার পরের অংশ আরো একটু সরে ওঠে—এভাবে বিভিন্ন অংশ আলাদা হয়। এখন লেন্সের নড়ার বেগ, ক্যামেরা থেকে বিজলির দূরত্ব ইত্যাদি খবর জানা থাকলে ছবিতে ওঠা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দূরত্বের ও সময়ের পার্থক্য হিসেব কষে বের করা যায়। এভাবে এক মাইক্রো সেকেণ্ড অর্থাৎ সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে যেটুকু ঘটে তাকেও আলাদা করে দেখা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক অতিদ্রুত চলচ্চিত্রেও এ কাজটি সম্ভব। কিন্তু বয়েজ ক্যামেরা তুলনামূলকভাবে সরল ও হালকা-পাতলা হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বেশি সুবিধাজনক।

যেই পথ লক্ষ্য করে

বাতাস সাধারণত বিদ্যুতের পরিবাহী নয়। কিন্তু প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চাপ বাতাসের বাধাকে অতিক্রম করে চার্জের প্রবাহ ঘটাতে পারে। এর যে প্রান্তে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের তীব্রতা অধিক সেখানে কয়েকটা মাত্র ইলেকট্রন দিয়ে প্রক্রিয়াটি শুরু হতে পারে। ইতস্তত সঞ্চরমান এ রকম ইলেকট্রনের অভাব বাতাসে নেই। বিদ্যুৎ চাপের প্রভাবে একটি ইলেকট্রন ধনাত্মক প্রান্তের দিকে অগ্রসর হয় ঘণ্টায় প্রায় হাজার মাইল বেগে। পথের মধ্যে বাতাসের যে-সব অণুকে এটা আঘাত করবে তাদেরও কিছু ইলেকট্রন খসে পড়ে এ সংঘাতে। এসব খসে পড়া মুক্ত ইলেকট্রনও এবার এগোবার দলে যোগ দেয়। সেগুলো আবার আরো ইলেকট্রন খসাবার ব্যবস্থা করে একইভাবে। খুব দ্রুত এক ইলেকট্রন তার মতো প্রবহমান বহু ইলেকট্রনের সৃষ্টি করে। এটা অনেকটা পর্বতের উপর থেকে প্রস্তর খণ্ড গড়িয়ে পড়ার হিমানী সম্প্রপাতের (এভেল্যাঞ্চ) মতো কাজ করে। এক পাথর যে রকম গড়িয়ে পড়ার সময় ক্রমাগত অধিক পাথরকে নীচে নামাতে থাকে এও অনেকটা সে রকম। তাই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় এভেল্যাঞ্চ। যে-সব অণু থেকে ইলেকট্রন খসে পড়ে সেগুলো হয়ে পড়ে ধনাত্মক আয়ন।

ধনাত্মক আয়নগুলো বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ধনাত্মক প্রান্তকে আরো জোরদার করে বাড়তি ইলেকট্রনের ওপর আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। ফলে আরো ইলেকট্রন এভেল্যাঞ্চে যোগ দেয়। এভাবে শেষপর্যন্ত মেঘ আর ভূমির মধ্যে অসংখ্য ইলেকট্রন আর ধনাত্মক আয়নে গড়া একটি নিরবিচ্ছিন্ন পরিবাহী পথের সৃষ্টি হয়। বাতাস বিদ্যুতের কুপরিবাহী হতে পারে, কিন্তু

এই পথ বিজলির জন্য মেঘ ও ভূমির মধ্যে একটি সহজ সেতুবন্ধ তৈরি করে দেয়। একে বলা হয় স্ট্রিমার, আমরা বলতে পারি বজ্রপথ।

শুরুতে যে বজ্রপথ তৈরি হয় তা কিন্তু সোজা নয় মোটেই, বরং আঁকা বাঁকা, ধাপে ধাপে চলে। বিজলী শুরু হবার পর অগ্রভাগে বজ্রপথের যেটুকু তাকে বলা হয় দিশারী বজ্রপথ (পাইলট স্ট্রিমার)। এটা ১০ থেকে৩০ ফুট এগিয়ে যেন একটু থমকে দাঁড়ায়। এর কারণ বাতাসের অণু থেকে ইলেকট্রন খসে গিয়ে আয়নের সৃষ্টি যেমন হয়, তেমনি একটা প্রবণতা সব সময় থাকে আয়নে আর ইলেকট্রনে আবার পুনর্মিলন হয়ে যেই অণু সেই অণু হয়ে পড়ার। এ রকম পুনর্মিলনের ফলে দিশারীর অগ্রভাগে বৈদ্যুতিক বাধাটি আবার বেড়ে যায়। ফলে প্রায় নতুন করে আবার ঘটতে হয় সংঘাত আর ইলেকট্রন খসার প্রক্রিয়াটি। ইতোমধ্যে দিশারী বজ্রপথ থমকে দাঁড়িয়ে থাকে ক্ষণিকের জন্য। আয়ন সৃষ্টির আরেকটি এভেল্যাঞ্চের হিড়িক পূর্ব-পথ বেয়ে অগ্রভাগে গিয়ে পৌঁছে। এভাবে শক্তির এক ঝলক নতুন সরবরাহ পেয়ে দিশারী এবার নতুন করে এগোয়—হয়তো অন্য অভিমুখে এমনকি হয়তো দুই বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে দুই বিভিন্ন অভিমুখে। এমনি করেই সৃষ্টি হয় বজ্রের আঁকা বাঁকা পথের আর তার শাখা প্রশাখার।

যে বজ্রপথ এভাবে সৃষ্টি হয় তার কাজ পথিকৃতের। আসল বিজলিকে যাবার জন্য সে পথ করে দেয়। প্রথম যে পথিকৃৎ ধাপে ধাপে এগোলো তাকে বলা হয় ধাপ পথিকৃৎ (ষ্টেপ্‌ড লীডার)। এর প্রতিটি ধাপ তৈরি হতে প্রায় ৫০ মাইক্রোসেকেণ্ডের মতো সময় লাগে। ধাপ পথিকৃৎ যখন ভূমি থেকে এক শ' দেড়শ,ফুট উপরে এসে পৌঁছে তখন ভূমির বিশেষ করে ভূমি সংলগ্ন উচ্চ সূচালো পরিবাহক বস্তু-গুলোর কাছাকাছি বিদ্যুৎ ক্ষেত্র তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত

হয়। এর ফলে এখান থেকে আর একটি বজ্রপথ উপরে উঠে গিয়ে নিম্নগামী পথিকৃতের সাথে মিলিত হয়।" এ ভাবেই বজ্রপথের সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে।

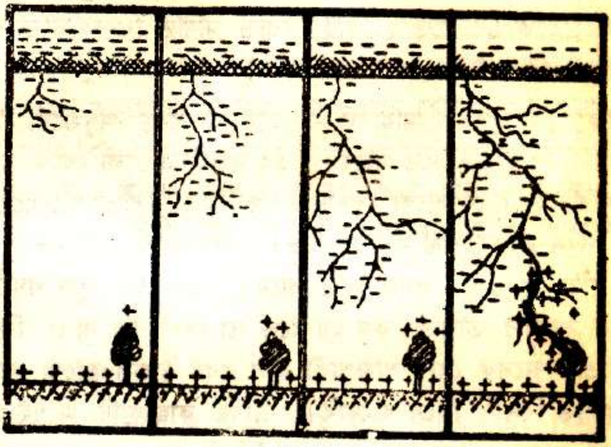

বিজলির ধাপ পথিকৃতের ক্রমান্বয়ে বজ্রপথ রচনা।
একেবারে ডানের ছবিতে এই ঋণাত্মক বজ্রপথের প্রভাবে উঁচু বৃক্ষ ইত্যাদি থেকে একটি ধনাত্মক বজ্রপথ উঠে তার সাথে মিলিত হচ্ছে। ফিরতি আঘাতেও এমনিভাবে উঠে যায়।

উজ্জ্বল ফিরতি আঘাত ও তারপর

ধাপ পথিকৃৎ যখন বিজলি প্রবাহের সহজ পথটি তৈরি করে দেয়, এই পথ ধরে ভূমি থেকে ধনাত্মক চার্জ ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে তাৎক্ষণিক-ভাবে। আসলে ধনাত্মক প্রান্তের কাছাকাছি ইলেকট্রনগুলো তার দিকে আকর্ষিত হয়ে এভেল্যাঞ্চ সৃষ্টি করে আগের মতোই। সেটিই আপেক্ষিকভাবে ধনাত্মক চার্জের ঊর্ধ্বমুখী হবার মতো। এভাবে

বিজলির ওপরের দিকে যাওয়াকে বলা হয় ফিরতি আঘাত। এবার পথ তৈরি করা রয়েছে বলে বিজলির প্রবাহ আরো জোরালো, আরো অনেক দ্রুত। বেচারা ধাপ পথিকৃৎকে থেমে থেমে বহু কষ্টে বজ্রপথ তৈরি করতে হয়েছে সময় লেগেছে মোটামুটি ২০,০০০ মাইক্রোসেকেণ্ডের মতো। আর ফিরতি আঘাত ফিরে যেতে পারে মাত্র ২০-৩০ মাইক্রো সেকেণ্ডের মধ্যে।

ইলেকট্রনের সংঘাতে আয়নিত না হয়ে বাতাসের অণুগুলো উত্তপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে পড়তে পারে। এর ফলেই এগুলো থেকে আলো নিঃসরিত হয়। জোরালো বিজলি তাৎক্ষণিকভাবে বাতাসে ৩০,০০০° সে. পর্যন্ত উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারে। আলোকময় এ বিজলির ব্যাস ছয় ইঞ্চি কি ৩ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। এর চেয়ে পুরু পথ দিয়ে গেলে আলোর তীব্রতা কম হয় বলে তা দেখা যায় না। ফিরতি আঘাতটি অনেক বেশি শক্তিশালী বলে এরই উজ্জ্বল আলো আমরা সাধারণত বিজলি হিসেবে দেখি। ভূমির কাছাকাছি অংশই বেশি উজ্জ্বল, কারণ এখানে আয়নগুলো সাম্প্রতিক বলে এখনো অবক্ষয়িত হতে পারেনি।

ফিরতি আঘাত ফিরে গেলেই কিন্তু বিজলির অবসান ঘটলো না। এরপর আবার নেমে আসতে পারে আরেকটি পথিকৃৎ নতুন পথের সন্ধান দিয়ে। প্রথম পথিকৃৎ নামার পর মেঘের ঐ অংশে চার্জের সঞ্চয়ে ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে অন্যান্য অংশের সাথে তার বিদ্যুৎ চাপ সৃষ্টি হয় এবং সেখান থেকে চার্জ এলে ঐ অংশ পুনরায় চার্জের সঞ্চয় লাভ করে। এভাবে আবার চার্জ পুষ্ট হয়ে নতুন পথিকৃৎ সৃষ্টির কাজ চলে। এবার যে পথিকৃত পথ তৈরি করে তাকে থমকে থমকে ধাপে ধাপে এগুতে হয় না, কারণ পথটি ইতোমধ্যেই আয়নিত, এভেল্যাঞ্চ এবার অবিচল গতিতে অগ্রসরমান

হতে পারে। সরাসরি পথে এগিয়ে যায় বলে এর নাম বর্শা পথিকৃৎ (ডার্ট লীডার)। বর্শা পথিকৃতের তৈরি পথ দিয়েও সঙ্গে সঙ্গে একটি ফিরতি আঘাত ফিরে আসে। এভাবে শুধু একবার নয়, বেশ কয়েকবার বর্শা পথিকৃৎ আর তার ফিরতি আঘাত চলতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মেঘের ঐ অংশের বিদ্যুৎ চাপ শেষবারের মতো কমে যায়, পুনর্বার চার্জ সঞ্চয় আর না ঘটে। সাত আটবার আসা যাওয়া বেশ স্বাভাবিক, কখনো এর চেয়েও বেশি বার হতে পারে। তবে প্রথম ফিরতি আঘাতের যে শক্তি ও যে ঔজ্জ্বল্য, পরের গুলোর তা থাকে না। আমরা যখন ক্ষণিকের জন্য বিজলির চমক দেখি তখন বুঝতেই পারি না এর মধ্যে এতবার বিজলির আনাগোনা চলছে।

বিজলির দৃশ্যভেদ

আমাদের চোখে নানা রূপে ধরা দেয় বলে বিভিন্ন দৃশ্যের বিজলিকে বিভিন্ন নাম দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটা হলো :

রেখা বিজলি : সরু রেখার আকারে যাদেরকে সব সময় দেখা যায়।

ফিতা বিজলি : জোরালো বাতাসে ছড়িয়ে প্রশস্ত হলে রেখা বিজলি-কেই ফিতার মতো দেখা যায়।

দানা বিজলি : একে ছোট ছোট উজ্জ্বল দানা সরু রেখার বিজলির সূতাতে মালার মতো গাঁথা রয়েছে এমনটি দেখায়। সূতাটি অদৃশ্য হবার পরও দানাগুলো দৃশ্যমান থাকে। খুব সম্ভব দানাগুলো হচ্ছে ধাপ পথিকৃতের প্রতি ধাপের উজ্জ্বল নিম্নাংশ। দেখার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে একে গোলগাল দেখায়।

পর্দা বিজলি : এটা মেঘের ভেতরের বিজলি, যার কথা আগেই বলা হয়েছে।

গোলক বিজলি : এটা একটা রহস্যময় বিজলি। উজ্জ্বল একটি গোলাকার বলের মতো ভাসতে দেখা গেছে বলে কেউ কেউ দাবি করেছেন কিন্তু এর বাস্তব অস্তিত্ব এবং এর ব্যাখ্যা এখনো নিঃসন্দেহ নয়।

মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে আমায় ডাকে

মেঘ গর্জন

নানা অনুমান

মেঘের ডাক মানুষকে ভয় পাইয়েছে, ভাল লাগিয়েছে এবং ভাবিয়েছে বহুদিন ধরে। কিন্তু এর উৎপত্তি সম্বন্ধে কেউ একটি ভাল অনুমানও করতে পারেনি বর্তমান শতাব্দীর আগে। এ নিয়ে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব গড়ে ওঠেছে মাত্র গত বিশ পঁচিশ বছরে। একটি কথা অবশ্য গোড়া থেকেই মানুষ জানতো তা হলো বিজলির চমকের সাথে এটা সম্পর্কিত।

এ সম্পর্কে যে কটা তত্ত্ব অনুমিত হয়েছে তার মধ্যে চারটি উল্লেখযোগ্য—

১. বিজলি যখন বাতাসের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে তখন তার চলার পথের বাতাস সরে যায় বলে এখানে আংশিক বায়ু শূন্যতার অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই শূন্য স্থান পূরণের জন্য আশপাশ থেকে বায়ু হুড়মুড় করে ওদিকে এগোলে আওয়াজ সৃষ্টি হয়।

২. বজ্রপথে বিজলি যে উচচ উত্তাপ সৃষ্টি করে তার ফলে এখানে জলকণাগুলো উত্তপ্ত বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্পের দ্রুত প্রসারণই শব্দ সৃষ্টির কারণ।

৩. পানির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এটা তার দুই উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। একে বলা হয় তাড়িৎ বিশ্লেষণ। বিজলির প্রবাহের সময় এখানকার জলকণাগুলো

তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন গ্যাসের সৃষ্টি করে। পরে এই দুই গ্যাস আবার মিলিত হতে চায় অতি সাগ্রহে। পুনর্মিলনের বিক্রিয়াটি বিস্ফোরণ জাতীয়, আর শব্দটি সেই বিস্ফোরণের।

৪. বাতাসের বিদ্যুৎ প্রবাহকে বাধা দেবার ক্ষমতা অধিক বলে বিজলি যাবার পথে বাতাস হঠাৎ খুব উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। অধিক তড়িৎ রোধী কোনো ধাতুর তার যে রকম বিদ্যুৎ প্রবাহের সময় উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে পড়ে এও অনেকটা সে রকম। অতি উত্তপ্ত বাতাস হঠাৎ করে প্রসারিত হয়ে শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এই শেষোক্ত তত্ত্বটিই সব চেয়ে সহজ ও সরাসরি। সাম্প্রতিক কালে প্রমাণিত হয়েছে যে এটিই সঠিক তত্ত্ব।

অবশ্য প্রথম তিনটি অনুমানও একেবারে ভিত্তিহীন নয়। ঠিকই বিজলির পথে বাতাসের চাপ কমে গিয়ে আংশিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়, ঠিকই এখানে জলকণা বাষ্পীভূত হয় এবং তাড়িৎ বিশ্লেষণ ও তৎপরবর্তী হাইড্রোজেন-অক্সিজেন সম্মিলনও ঘটে কিন্তু এদের কোনোটিকেই মেঘ গর্জনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না বরং বলা যায় এরা বজ্রের আনুষঙ্গিক ঘটনা। আংশিক শূন্যতা সৃষ্টিকে তো বজ্রের শব্দ তরঙ্গের একটি ফল বলা যায়।

শক্ তরঙ্গ ও শব্দ তরঙ্গ

বজ্রের প্রত্যেকটি আঘাতেই বজ্রপথে বাতাস উত্তপ্ত হয়, ফলে শব্দ সৃষ্টি হয় প্রত্যেকটিতেই। এর মধ্যে ধাপ পথিকৃৎ, তার ফিরতি আঘাত, পরপর বর্শা পথিকৃৎ ও তাদের ফিরতি আঘাতগুলো সবই পড়ে। শব্দের শক্তি নির্ভর করে বিজলি প্রবাহের প্রাবল্যের ওপর। তবে আঘাতগুলো একের পর এক এত দ্রুত সংঘটিত হয় যে তাদের প্রত্যেকটির শব্দকে আলাদা করে শোনা সম্ভব হয়না সম্মিলিত শব্দে এরা একাকার

হয়ে যায়। এমন কি শব্দের রেকর্ডিং থেকে যান্ত্রিক উপায়ে বিশ্লেষণেও তাদেরকে আলাদা করা যায় না।

বিজলি প্রবাহের ফলে বজ্রপথে উত্তপ্ত উচ্চ চাপ গ্যাসের সৃষ্টি হয়। উত্তাপ ৩০,০০০° সে. পর্যন্ত উঠতে পারে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। চাপ উঠতে পারে সমুদ্র সমতল বায়ুমণ্ডলের সাধারণ চাপের ১০ থেকে ১০০ গুণ পর্যন্ত। প্রথমে এই গ্যাস বিস্তারলাভ করে একটি শক্ তরঙ্গের রূপ নিয়ে। শক্ তরঙ্গও এক ধরনের শব্দ তরঙ্গ, তবে এটা মাধ্যমকে সঙ্কুচিত ও উত্তপ্ত করে এগোয় বলে এর গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। সাধারণ শব্দ তরঙ্গ ঐ মাধ্যমে যে গতিতে যেতো শক্ তরঙ্গ তার চেয়ে অধিক গতিতে যায়। শক্ তরঙ্গের ঠিক পেছনে বাতাস প্রসারণের পর্যায়ে থাকে যেখানে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। অগ্রগামী শক্ তরঙ্গের শক্তিটুকু ব্যয়িত হয়ে গেলে বজ্রপথের বায়ুচাপ আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। ঐ ব্যয়িত শক্তি এবার রূপান্তরিত হয় সাধারণ শব্দ তরঙ্গে। অবশ্য শক্ তরঙ্গের শক্তির শতকরা মাত্র এক ভাগই এভাবে শব্দ শক্তিতে পাওয়া যায়। বাকি শক্তি গ্যাস মাধ্যমকে উত্তপ্ত করতেই খরচ হয়ে যায়। যে শব্দ এভাবে বজ্রপথ থেকে বিস্তৃত তা কিন্তু সব দিকে সমানভাবে যায় না। বজ্রপথের পাশ থেকে আড়াআড়িভাবে যে শব্দ আসে তা লম্বালম্বি দিকে আসা শব্দের চেয়ে অধিকতর জোরালো হয়।

গুড় গুড়, গুড়ুম

বজ্রপথের পুরোটা সঞ্চরণ করতে বিজলির এত ক্ষুদ্র সময় লাগে যে কার্যত এর পুরোটাতেই যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা একই সাথে বিকীর্ণ হয়। তা ছাড়া আমরা দেখেছি পরপর বিভিন্ন আঘাতের শব্দও একাকার হয়ে থাকে। কিন্তু তবুও আমরা শোনার সময় বেশ খানিকক্ষণ

ধরে মেঘ গর্জন শুনতে থাকি একটি বিজলি চমকের পর। এর কারণ দীর্ঘ বজ্রপথের সব অংশ আমাদের কাছ থেকে সমান দূরত্বে নেই। সব অংশ থেকে উৎপন্ন শব্দও তাই আমাদের কাছে একই সঙ্গে এসে পৌঁছায় না। তা ছাড়া শ্রোতার সাথে আপেক্ষিকভাবে বিজলির অভিমুখ, এর দৈর্ঘ্য ইত্যাদি শব্দের প্রকৃতি নির্ধারণ করে।

যে শ্রোতার দিকে বিজলি এগিয়ে আসে অর্থাৎ যার অবস্থান বিজলির অগ্রগামী প্রান্তের দিকে তার কাছে অপেক্ষাকৃত নিম্ন তীব্রতর শব্দ পর্যায়ক্রমে আঁকা বাঁকা বিভিন্ন অংশ থেকে আসতে থাকে। ফলে তার কাছে মেঘ গর্জনের শব্দ হবে পরস্পরের সাথে জড়ানো দীর্ঘস্থায়ী একটা গুড় গুড় শব্দ, অপেক্ষাকৃত চাপা ধরনের। আবার যে শ্রোতার অবস্থান বিজলির পাশ বরাবর তার কাছে পুরো বিজলি রেখাটা প্রায় সমান দূরত্বে রয়েছে, উচ্চ তীব্রতার একটি শব্দ পুরোটা থেকে একই সঙ্গে আসবে, শব্দটা তাই হবে 'গুড়ুম' এ রকম একটি তীব্র ও সংক্ষিপ্ত ধরনের। সাধারণত যে কোনো শ্রোতার অবস্থান হয় এই দুয়ের মাঝামাঝি একটা কিছু। তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিজলির কোনো অংশ লম্বালম্বি এবং কোনো অংশ পাশাপাশি থাকে। কাজেই তার কাছে মেঘ গর্জন যেভাবে পৌঁছবে তাতে গুড় গুড় একটানা শব্দ যেমন থাকবে তেমনি থাকবে তীব্র গুড়ুম। এই দুয়ের সংমিশ্রণেই শব্দটা তৈরি হবে।

মাধ্যমের প্রভাব

বজ্রপথে উৎপন্ন হয়ে শ্রোতার কানে আসা অবধি যে জায়গার মধ্য দিয়ে মেঘ গর্জনকে অতিক্রম করতে হয় তাও গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যতই দূরত্ব অতিক্রম করবে ততই মন্দীভূত হবার ফলে শব্দের তীব্রতা হ্রাস পাবে। আবার মাধ্যমের কারণে পথের মধ্যে

শব্দ এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হবে। এই উভয় প্রক্রিয়া অধিক কার্যকর অপেক্ষাকৃত উচ্চতর খাদ (ফ্রিকোয়েন্সি). অর্থাৎ তীক্ষ্ণতর শব্দের জন্য। কাজেই বেশি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলে বজ্র গর্জনের তীক্ষ্ণতর অংশগুলো হারিয়ে যায়, টিকে থাকে শুধু ভারী নিম্ন খাদের শব্দগুলো। তাই দূরের জোরালো বজ্রের তীক্ষ্ণ গুড়ুম শব্দের বদলে ভারী গম্ভীর 'বুম্'-এরকম শব্দ পাওয়া যায় অনেকটা তোপধ্বনির মতো। এটা শুধু শোনাই যায় না, নিম্নখাদের বলে এর কাঁপুনি রীতিমত অনুভব করা যায়, জানালার কাঁচ ইত্যাদিও শব্দ করে কেঁপে উঠতে পারে। মেঘের যে চাপা গম্ভীর নিনাদের কথা বলা হয় তার উৎপত্তি এভাবেই। দূরের বজ্র যথেষ্ট জোরালো না হলে অবশ্য অবশিষ্ট এই গম্ভীর আওয়াজও আর কানে এসে পৌঁছায় না।

মাধ্যমের আর যে প্রভাব কাজ করে তা হলো শব্দের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ। শব্দ যখন বজ্রপথ থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন তার কোনো কোনো অংশ মেঘের গায়ে কিংবা পাহাড়ের গায়ে প্রতিফলিত হতে পারে। এ সব প্রতিফলিত শব্দও শ্রোতার কানে পৌঁছুতে পারে প্রতিধ্বনির রূপ নিয়ে। এগুলোও মেঘের দীর্ঘস্থায়ী গুড় গুড় গর্জনের জন্য দায়ি। অন্যান্য তরঙ্গের মত শব্দ তরঙ্গও এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশের সময় প্রতিসরিত হয়ে বেঁকে যেতে পারে। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় বাতাসের উত্তাপ ও ঘনত্ব বিভিন্ন রকম হয়। উচ্চতা কমার সাথে উত্তাপ ও ঘনত্ব বাড়তে থাকে। এসব বায়ুস্তরের একটি থেকে অধিক ঘনত্বের অন্যটিতে যাবার সময় বজ্রের শব্দ প্রতিসরিত হয়ে ওপরের দিকে বেঁকে যায়। এর ফলে বজ্রপথ থেকে খানিকটা দূরত্বের পর বজ্রের গর্জন আর শোনাই যায় না। শব্দ বেঁকে গিয়ে সেখানকার শ্রোতার মাথার ওপর দিয়েই চলে যায়। বায়ু স্রোতের গতি অনেক সময় এই বেঁকে যাবার প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে।

বায়ুমণ্ডলের ছোট বড় ঘূর্ণি ও চঞ্চলতার কারণেও বজ্রের শব্দ এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়। কাজেই বজ্র গর্জনের প্রকৃতি সরল না হবার বহুতরো কারণ রয়ে গেছে। এদের বিশ্লেষণের যে গবেষণা তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এ গবেষণায় সাধারণত বিভিন্ন অব-স্থানে মাইক্রোফোন বসিয়ে একই বজ্র গর্জনের রেকর্ড করা হয়। পরে সুকৌশলে তার বিশ্লেষণ করে বজ্র গর্জন সম্বন্ধে তো বটেই, সার্বিক-ভাবে বজ্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভও সম্ভব হচ্ছে।

এ বজ্র কত দূরে

আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এটি এতই দ্রুত বেগ যে বিজলির আলো সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তাৎক্ষণিক ভাবেই ওটা আমাদের চোখে পৌঁছে যায়। কিন্তু একই সাথে যে শব্দের সৃষ্টি হলো তার গতি অনেক মন্থর। বাতাসের উত্তাপ, ঘনত্ব ইত্যাদি নানা কিছুর ওপর কিছুটা নির্ভর করলেও এর গতিবেগ সেকেণ্ডে মোটামুটি এগারশ ত্রিশ ফুটের মতো। কাজেই বিজলি চমকের পর তার শব্দ আমাদের কাছে এসে পৌঁছুতে সাধারণত কয়েক সেকেণ্ড লেগে যায়। আলো দেখার কতক্ষণ পর শব্দ শোনা গেল তা লক্ষ্য করে বিজলিটি কতদূরে তা নির্ণয় সম্ভব।

এর একটি সহজ নিয়ম সবাই মনে রাখতে পারে এবং অনায়াসে প্রয়োগ করতে পারে। আলো দেখার সাথে সাথে সেকেণ্ড গুণতে আরম্ভ করে দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রথম শব্দ শোনা যায়। সেকেণ্ডের এই সংখ্যাকে ৫ দিয়ে ভাগ করতে হবে কারণ ১১৩০ ফুট এক মাইলের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। ভাগফল যত, বিজলি চমকেছে তত মাইল দূরে। অবশ্য বোঝাই যাচ্ছে নানা, কারণে এটা নেহাত মোটামুটি একটা হিসেব মাত্র।

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো

ধ্বংস সৃষ্টি নিরাপত্তা

বজ্রঘাতের ক্ষতি

উঁচু ও সূঁচালো ভূমি সংলগ্ন বিদ্যুৎ পরিবাহক বজ্র পথের প্রান্ত হবার জন্য খুবই উপযোগী—তা আমরা দেখেছি। এরা বাতাসের মধ্য দিয়ে ধনাত্মক আয়নের পথ বিছিয়ে আগ বাড়িয়ে গিয়ে বিজলি রেখাকে অভ্যর্থনা করে আনে। তাই উঁচু বাড়ি, চিমনী, মন্দির বা গির্জার উঁচু চূড়া, উঁচু গাছপালা এ সব জায়গায় বজ্রপাতের সম্ভাবনা বেশি। এত শক্তিশালী একটি বিদ্যুৎ প্রবাহ ভেতর দিয়ে চলে গেলে জান-মালের কি ক্ষতি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে বজ্রপাত তীব্র বৈদ্যুতিক শকের সৃষ্টি করতে পারে তা ছাড়া বজ্রাঘাতে গায়ের মাংসপেশী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া, গুরুতরভাবে পুড়ে যাওয়া— সব সম্ভব। গাছপালারও অত্যন্ত ক্ষতি হতে পারে বজ্রপাতে। বিজলির অতি উচ্চ উত্তাপের কথা মনে রাখলে এটা যে গাছের শাস বাকল সব বিস্ফারিত করে দিতে পারে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। শুষ্ক উষ্ণ বনাঞ্চলে বজ্রপাত প্রায়ই দাবানল সৃষ্টির কারণ হয়। এভাবে বন থেকে বন উজাড় হয়ে যেতে পারে। বজ্রাঘাতের বিস্ফোরণে ভূমিতে দশফুট চওড়া এক ফুট গভীর খাদ সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। অনেক সময় ভূমিতে এটা বালিকে গলিয়ে কাচ সদৃশ খনিজ ফুলগুরাইট তৈরি করে।

হাই ভোল্টেজ লাইনের উপর বিজলি আকৃষ্ট হয়ে এর অন্তরক আবরণগুলো নষ্ট করে দিতে পারে, তখন এরা আর নিরাপদ থাকে না, সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হয়। তা ছাড়া শক্তিশালী বিজলির বৈদ্যুতিক প্রভাবে বিদ্যুৎ লাইনে হঠাৎ করে একটি উচ্চ প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে অনেক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নষ্ট করে দিতে পারে। এভাবে বজ্রপাত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটায়।

বৈমানিক বজ্র মেঘকে খুব সমীহ করে চলেন। এর মধ্যে ঢোকাটা তাঁর ভারি অপছন্দ—কারণ ওরকম তোলপাড় করা অবস্থাতে বিমানের নিয়ন্ত্রণ রাখা কঠিন। বিমানের বাইরে থাকা নানা নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ক্ষতি করলেও বিজলির আঘাত অবশ্য ভেতরের আরোহীদের ক্ষতি করার সম্ভাবনা কম। বিদ্যুৎ পরিবাহক ধাতু দিয়ে গড়া বলে যাত্রীদের জন্য বিমানটি একটি নিরাপদ খাঁচার কাজ করবে। বিদ্যুৎ প্রবাহ বিমানের গা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সরে যাবে।

এটা ঠিক যে বজ্রপাতের যে ক্ষতি তা অহরহ ঘটে না। কিন্তু সারা দুনিয়ায় যে পরিমাণ বজ্র মেঘ প্রতি বছর সক্রিয় হয় সে সংখ্যাটি নেহাৎ ছোট নয়। এক হিসাবে দেখা যায় এই সংখ্যা বছরে দেড় কোটিরও অধিক। এদের গড় আয়ুষ্কাল যদি এক ঘণ্টাও ধরা হয় তা হলে পৃথিবীতে সব সময় ১৮০০টি বজ্র মেঘ সক্রিয় রয়েছে আর প্রতি সেকেণ্ডে এদের থেকে বজ্রপাত ঘটছে প্রায় ১০০টি। নিরক্ষীয় অঞ্চল হচ্ছে সব চেয়ে বজ্র সঙ্কুল এলাকা। ইন্দোনেশিয়ার জাভাতে বজ্রপাতের পরিমাণ সব চেয়ে বেশি। এর যে কোনো স্থান থেকে বছরের গড়ে ২২১ দিন বজ্রের গর্জন শোনা যায়। তাছাড়া মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ মেক্সিকো, পানামা, মধ্য ব্রাজিল ইত্যাদি জায়গাও যথেষ্ট বজ্র সঙ্কুল। অপরপক্ষে ইউরোপের অধিকাংশ জায়গা থেকে বছরে ১১ দিনের বেশি বজ্র গর্জন শোনার সম্ভাবনা কম। মধ্য সাহারায় এই পরিমাণ

বছরে একবার আর মেরু বৃত্তের ভেতর বড় জোর দশ বছরে একবার।

সৃষ্টিশীল বজ্র

বজ্রের সব সম্পর্ক ধ্বংসের সাথে নয়। পৃথিবীর শৈশব থেকে সৃষ্টির সাথেও তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পৃথিবীর সৃষ্টির পর ভূ-ত্বক তখন সবে কঠিন হয়ে উঠেছে, পৃথিবী পৃষ্ঠ অত্যন্ত উত্তপ্ত, আকাশ ঘন মেঘের আবরণে ঢাকা, এমনি অবস্থায় চার-পাঁচশ' কোটি বছর ধরে ক্রমাগত বজ্রবৃষ্টি চলেছে ঐ বিশাল মেঘ স্তর থেকে। নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিজলি চমকেছে, বজ্র গর্জেছে, মুষল ধারায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। অবশেষে পৃথিবীর উপরটা যথেষ্ট ঠাণ্ডা হলো, মেঘের আবরণ খানিকটা সরলো, সূর্যালোক এসে পৌঁছুলো ধরণীতে, দেখা দিলো আজকের দিনের মতো জলবায়ুর বৈচিত্র্য। ঐ প্রাথমিক বজ্রপাতের সাথে হয়তো পৃথিবীর বুকে প্রাণের প্রথম স্পন্দন সৃষ্টির সম্পর্ক রয়েছে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন ঐ বজ্রাঘাতের শক্তিতেই প্রাণ সৃষ্টির জৈব উপাদান-গুলো প্রথম সংশ্লেষিত হবার সুযোগ লাভ করেছিলো সমুদ্রজলকে আশ্রয় করে।

ভূ-ত্বকের গায়ে ঋণাত্মক ইলেকট্রনের একটি আবরণ ছড়ানো রয়েছে। যা পুরো পৃথিবী পৃষ্ঠ বিস্তৃত হয়ে একে সব সময় একটা ঋণাত্মক চার্জ দিয়ে রেখেছে। যদিও এই চার্জের ঘনত্ব অধিক নয়। তবুও এটি গুরুত্বপুর্ণ। বিস্ময়ের বিষয় ছিলো এই চার্জ এখানে থাকছে কি করে। নানা কারণে বায়ুমণ্ডলে সাধারণত ধনাত্মক আয়নের আধিক্য থাকে। কাজেই সব সময় একটি সম্ভাবনা থাকে পৃথিবীর ঐ ঋণাত্মক চার্জ একটু একটু করে বাতাসে উড়ে গিয়ে ওখানকার ধনাত্মক আয়নের সাথে মিলে বিলীন হয়ে যাবার। সেটা যদি এককভাবে ঘটতো তা হলে

শেষপর্যন্ত পৃথিবীর ঋণাত্মক চার্জের কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না, এর বৈদ্যুতিক প্রকৃতিটাই বদলে যেত।

এখন আমরা জানি পৃথিবীর চার্জ ভাণ্ডার সম্পূর্ণ থাকতে পারছে, কারণ বজ্রপাতের মাধ্যমে ঋণাত্মক চার্জ বার বার তার বুকে ফেরৎ আসছে। বজ্রের ফিরতি আঘাতে ধনাত্মক চার্জের শক্তিশালী প্রবাহ ভূমি ছেড়ে উপরের দিকে যায়। তা ছাড়া বজ্র মেঘের তলায় ভূমি-সংলগ্ন সব সূচালো পরিবাহী থেকে অদৃশ্যে ও নীরবে ধনাত্মক চার্জ বাতাসে যাবার কথাও আমরা জেনেছি। গাছপালা, উঁচু দালান, লৌহদণ্ড সবই এ ভাবে ধনাত্মক চার্জদান করে। এভাবে ধনাত্মক চার্জ ভূ-পৃষ্ঠ ছেড়ে যাবার অর্থ হলো সেখানে ঋণাত্মক চার্জের সৃষ্টি। এ সব চার্জ ভূ-ত্বকে শুধু জমাই হয় না তা ভূ-ত্বকের গা বেয়ে সর্বত্র বিতরিত হয়— যেখানে বজ্র মেঘ নেই সেখানেও। বৃষ্টির ফোঁটার সাথে অবশ্য কিছু কিছু ধনাত্মক চার্জ আবার ভূ-পৃষ্ঠে ফেরৎ এসে এই প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু এভাবে ফেরৎ আসা ধনাত্মক চার্জের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। বজ্রপাত তাই পৃথিবীর বৈদ্যুতিক ভারসাম্য বজায় রাখে—এ তার একটি সৃষ্টিশীল দিক।

উদ্ভিদ জগতের (ও প্রকারান্তে প্রাণী জগতের) বাঁচার জন্য গাছের প্রয়োজন নাইট্রোজেন সার। বাতাসের চারভাগের তিনভাগই নাইট্রোজেন। কিন্তু ওরকম মুক্ত নাইট্রোজেন গ্রহণ করার কোনো কায়দা উদ্ভিদের নেই। কোনো ভাবে বাতাসের নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য একটা যৌগের মধ্যে বাঁধতে পারলে তবেই এটা কাজে আসে। এভাবে বাঁধাকে বলা হয় নাইট্রোজেনের স্থিরীকরণ (ফিক্সেশন)। মাটির মধ্যে এক ধরনের জীবাণু এতে সহায়তা করে। তাছাড়া বজ্রপাতেরও একটি বড় ভূমিকা রয়েছে নাইট্রোজেনের স্থিরীকরণে। বিজলির সৃষ্ট উচ্চ তাপ ও চাপ বাতাসের

নাইট্রোজেনকে নাইট্রিক ও নাইট্রাস অক্সাইডে পরিণত করে অক্সিজেনের সাথে যোগ ঘটিয়ে। বৃষ্টির পানির সাথে এরা নাইট্রাইট বা নাইট্রেট হিসেবে মাটিতে গিয়ে মেশে। দেখা গেছে এভাবে বজ্রপাত পৃথিবীকে বছরে ১০ কোটি টন নাইট্রোজেন সারের যোগান দিচ্ছে। এরপর কে বলবে যে বজ্র শুধু ধ্বংসই করে যায়।

বিজলি দণ্ড

বজ্রের আলোচনার একেবারে শুরুতে স্মরণ করতে হয়েছিলো বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে। তেমনি এর শেষ পর্যায়ে এসে আবার তাঁর স্মরণ নিতে হবে। বজ্রাঘাতের হাত থেকে রক্ষা পাবার সুন্দর সহজ কৌশলটি তিনিই উদ্ভাবন করেছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন নিজেই প্রশ্ন তুলেছিলেন বিদ্যুৎ মেশিনের স্ফুলিঙ্গের মত সুঁচালো ধাতু দণ্ডে বিজলি আকৃষ্ট হবে কিনা। তাঁরই প্রস্তাবিত পরীক্ষায় সেটিই প্রমাণিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এর মধ্যে দেখলেন বজ্র থেকে নিরাপত্তার উপায়।

দীর্ঘ একটি লৌহ দণ্ডকে দালানের ছাদ থেকে খাড়া করা হলো আর তার সাথে ধাতুর তার দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ দিয়ে রাখা হলো ভূমির। বজ্রপথের পথিকৃৎ যখন ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি এসে পৌঁছে, তখন এরকম দণ্ড থেকে চার্জ বিস্তৃত হয়ে আগ বাড়িয়ে সেই পথকে কাছে টেনে নেবে তার নিজের দিকে। বিজলির বিদ্যুৎ প্রবাহ সেখান থেকে ধাতুর তার বেয়ে নিরুপদ্রবে চলে যাবে ভূমিতে। কাছাকাছি আর কোথাও বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকবে না আর তাই সেখানকার জানমালও থাকবে নিরাপদে। এই লৌহ দণ্ডকে বলা হলো বিজলি দণ্ড, আর তা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো আমেরিকা ও ইউরোপে।

কৌশলটি খুব সাধারণ হলেও উদ্ভাবনটি কিন্তু মোটেই সাধারণ কোনো ঘটনা ছিলো না। মানুষ এই প্রথম বজ্রের মতো ভীতিপ্রদ একটি প্রচণ্ড শক্তির টুটি চেপে ধরে তাকে নিরাপদ সমাধিস্থ করার উপায় হাতে পেলো। সঙ্গত কারণেই সেদিন এ নিয়ে চাঞ্চল্য কম হয়নি। বিজলি দণ্ড তৈরির এমন হিড়িক পড়ে যায় যে অদ্ভুত অদ্ভুত আকৃতির জবরজঙ্গ সব দণ্ড তৈরি হতে থাকে আর খোদকারি চলতে থাকে ফ্রাঙ্কলিনের মূল সরল কৌশলটির উপর। পরে অবশ্য দেখা গেছে এগুলো নেহাৎ অপ্রয়োজনীয়, বাড়তি কোনো লাভ তাতে হয় না। বরং ফ্রাঙ্কলিন যে দণ্ডটি সূঁচালো হওয়ার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাও জরুরী নয়— একটা লৌহ দণ্ড হলেই হলো। আধুনিক কালে অবশ্য সুউচ্চ দালানগুলোর জন্য বিজলি দণ্ডেরই প্রয়োজন হয় না। এদের কাঠামোর মধ্যে যে লোহা থাকে তাই ছাদ থেকে ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এই কাঠামোই দিব্যি বিজলি দণ্ডের কাজ করতে পারে।

মেনে চলার কিছু নিয়ম

এই বইয়ের সর্বত্র আমরা প্রকৃতির কথাই বিশেষ করে জেনেছি। জেনেছি কেমন করে মেঘের সৃষ্টি হয়, মেঘের পানি বৃষ্টিরূপে নামে আর কেমন করেই বা কোনো কোনো মেঘ বজ্রগর্ভ হয়ে আঘাত হানে। প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করতে থাকুক। কিন্তু যেখানে বিপদের আশঙ্কা সেখানে প্রকৃতিকে বুঝতে পারাটা সার্থক হয় যদি আমরা সে বিপদ অন্তত কিছুটা কমাতে পারি। বজ্রাঘাতের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিছু সাধারণ নিয়মের অবতারণা করেই এই বইয়ের ইতি টানা যেতে পারে।

বজ্র বৃষ্টির সময় বাইরে থেকে ঘরেই নিরাপত্তা বেশি, তবে এ সময় বৈদ্যুতিক তার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, পানির পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করা উচিত নয়। একই কারণে ছাদে এন্টেনা রয়েছে এমন টেলিভিশন স্পর্শ করা উচিত নয় সেটা চালু থাকুক বা না থাকুক। টেলিফোন ব্যবহারও নিরাপদ নয়, কারণ টেলিফোনের থাম বাইরে থাকে। ঘরের জানালা খোলা রইলো কি বন্ধ রইলো তাতে কিছু আসে যায় না বিজলি যদি ঘরে ঢুকবেই তা হলে দেয়াল ভেদ করেই ঢুকতে পারে, জানালা কোন ছার। তবে পাকা ঘরে লোহার কাঠামো থাকলে তা বেশ নিরাপদ।

বিপদের আশঙ্কা বাড়ে যদি বজ্র বৃষ্টির সময় বাইরে থাকতে হয়। দু পাশে সুউচ্চ দালান রয়েছে নগরীর এমন রাস্তায় থাকলে ভয় কম কারণ রাস্তার মানুষের চেয়ে ও সব দালানই বিজলির কাছে আকর্ষণীয়। যদি খোলা জায়গায় থাকতে হয় তা হলেই বিপদ। খোলা মাঠের উপর দাঁড়িয়ে থাকা মানুষই সব চেয়ে উঁচু জিনিস তাই বিজলিকে সে নিজেই আকৃষ্ট করতে পারে। সে অবস্থায় উচিত হবে সটান শুয়ে পড়া মাটিতে, যতক্ষণ বজ্র বৃষ্টি না থামছে। বৃষ্টিতে ভেজার ভয়ে গাছের তলায় আশ্রয় নেয়াটা বোকামী কারণ গাছ বিজলির স্বাভাবিক লক্ষ্য বস্তু।

বজ্র-বৃষ্টির সময় বাইরে গোসল করা বা সাঁতার কাটা একেবারেই অনুচিত, পানি বিজলির উত্তম পরিবাহী। ও সময় লঞ্চে বা ষ্টিমারে থাকলে ডেকের উপরে না থেকে ভেতরে খোলের মধ্যে থাকাই নিরাপদ। একই-ভাবে মোটর গাড়ির ভেতরটাও বেশ নিরাপদ। বিজলি ওখানে আঘাত হানলেও ধাতব বহিরঙ্গ বেয়ে পানিতে বা ভূমিতে চলে যাবে।

. . . . . . এ গ্রন্থমালার বই সবার জন্যে। . . . . .

বৃষ্টি আমাদের ঘিরে রাখে। বৃষ্টি নামে সবার আঙিনায়।
বজ্র চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কি এই বৃষ্টি? কি এই বজ্র?
বৃষ্টি ও বজ্রের স্বরূপ নিয়ে এ বই।